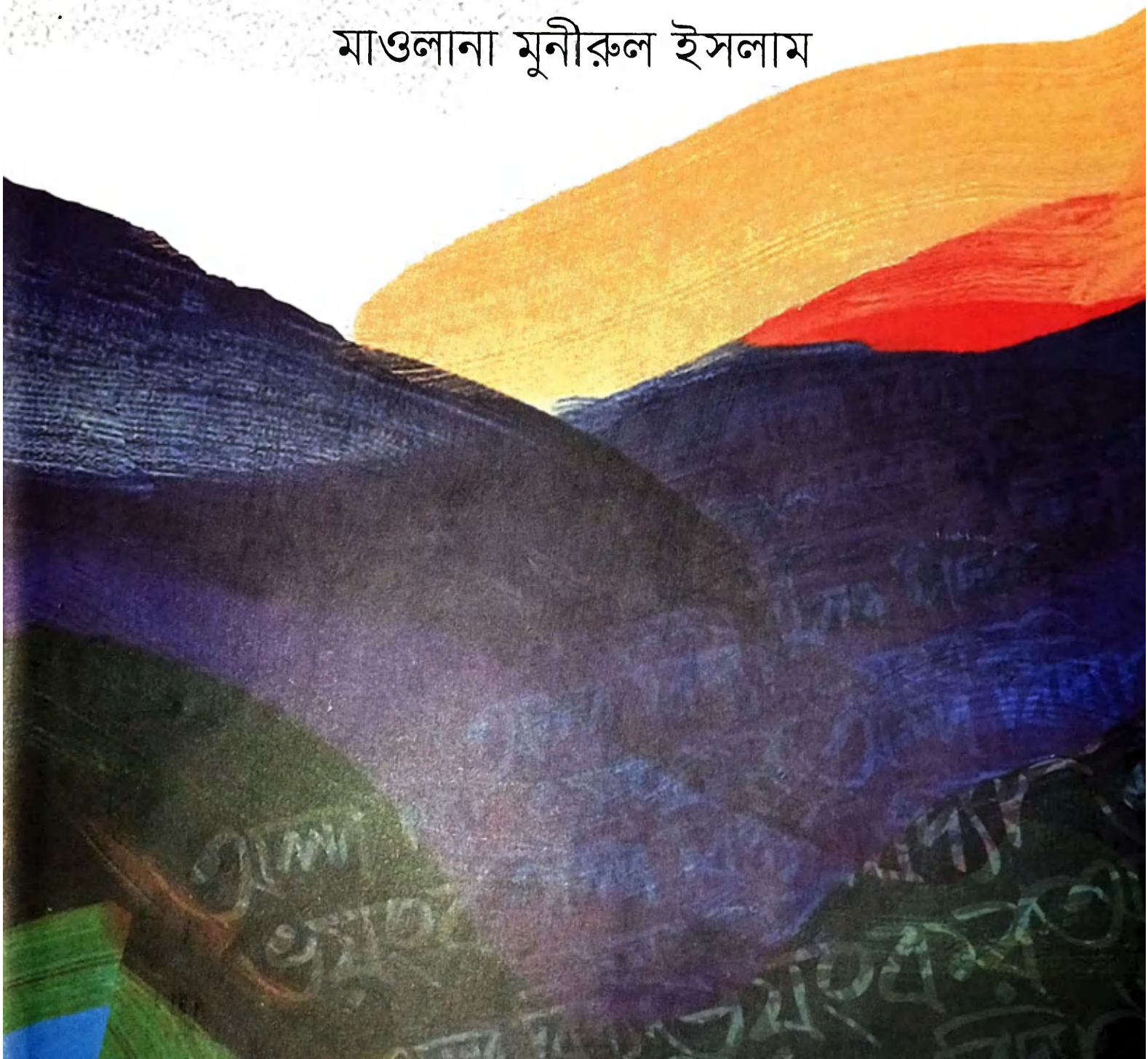
শিক্ষণীয় মজার গল্পের চমৎকার সমাবেশ

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম



শিক্ষণীয় মজার গল্পের চমৎকার সমাবেশ

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম

সাবেক সহকারী সম্পাদক, মাসিক আদর্শ নারী

সহসভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরাম

রেজাউল করিম
PDF

আনোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫

প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০১৬ ইং
দশম মুদ্রণ	অক্টোবর ২০২২ ইং

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর

মূল	মাওলানা মুনীরুল ইসলাম
প্রকাশক	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন আনোয়ার লাইব্রেরী ১১/১ ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	২৮০.০০ টাকা মাত্র

অর্পণ

বন্ধুবর শিক্ষক, কবি, উপন্যাসিক
তানভীর মতিন
২০০৪ সালে যে আমার প্রথম বই প্রকাশে সহযোগিতা করে
আমার বই প্রকাশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন
👇
https://t.me/islaMic_fdf

লেখকের প্রকাশিত আরো কিছু বই

০১। ঘুমিয়ে কাজা করছি ফজর
০২। পৃথিবীতে হলো হাশরের বিচার
০৩। সেরা উনচল্লিশ এবং আমি
০৪। বিজয় নামের পাখি
০৫। রক্তভেজা জায়নামায
০৬। আল-কুরআনের জ্ঞানসমুদ্র
০৭। লোকটা শয়তানের বন্ধু
০৮। সুখে থাকলে ভূতে কিলায়
০৯। টুপির ভেতরের ছড়া
১০। ঈমানের ফুলবাগান
১১। যেমন কর্ম তেমন ফল

প্রকাশকের কথা

'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর' উপদেশমূলক একটি গল্পের বই। তরুণ পাঠকশ্রেণীর কাছে গল্প একটি সুখপাঠ্য বিষয়। গল্পের প্রতি তাদের আগ্রহ প্রবল। তরুণ পাঠকশ্রেণীর মনোজগত ও মননশীলতা সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার হলো গল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ গল্পের বইগুলো মননশীলতা সৃষ্টির সহায়ক নয়। সেখানে আদর্শ বলতে থাকে না কিছুই। এর বিকল্প হিসেবে প্রয়োজন আদর্শ ও পরিমার্জিত সৃষ্টিশীল গল্প তৈরি করা। আলহামদুলিল্লাহ, বর্তমানে অনেক আলেম ভালো আদর্শমণ্ডিত ও পরিমার্জিত গল্প লিখছেন।

মাসিক আদর্শ নারী'র সাবেক সহকারী সম্পাদক, নন্দিত লেখক মাওলানা মুনীরুল ইসলাম ইতোমধ্যে বেশ কিছু ভালো মানের শিক্ষণীয় গল্পের বই লিখেছেন। তার মধ্যে *সুখে থাকলে ভূতে কিলায়* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বক্ষমাণ বইটিতেও তিনি কতগুলো শিক্ষণীয় মজার গল্পের চমৎকার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। আমাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'আনোয়ার লাইব্রেরী' থেকে বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি গল্পগুলো পাঠকদের হৃদয়ে নাড়া দিবে, শিক্ষার খোরাক জোগাবে এবং মননশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ আমাদের সকলের মেহনত কবুল করুন। আমিন।

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
স্বত্বাধিকারী
আনোয়ার লাইব্রেরী

তারিখ : ২০ অক্টোবর ২০১৬

লেখকের কথা

প্রশংসা শুধুই আল্লাহ তাআলার জন্য। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক বিশ্বমানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আমাদের প্রতিটি সম্ভাবনাময় কিশোরপ্রাণেই লুকিয়ে আছে একেকটি বাংলাদেশ। আমরা সত্য ও শুদ্ধ হলে বাংলাদেশ সত্য ও শুদ্ধ হবে। আমরা সুন্দর ও কল্যাণকামী হলে বাংলাদেশ সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের এই পরিচর্যা ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করতে পারলে পরিবার থেকে পৃথিবীময় বিরাজ করবে এর সুবাতাস। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে হলে সবার আগে নিজেকেই গড়ে তুলতে হয়।

পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক নবী-রাসূল আলাইহিস সালামই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেই বার্তা দিয়েই পাঠিয়েছেন। তাঁর আনিত ও প্রচারিত সেই সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের সমন্বিত নাম ইসলাম। আর সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের বার্তাবাহী কতগুলো চিত্তবিনোদনমূলক শিক্ষণীয় গল্পের মলাটবদ্ধ রূপই 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর'। জানা-অজানা–রূপকথা-সত্যকথার কতগুলো হাসি-মজার গল্পের সমাবেশ ঘটেছে-গ্রন্থটিতে। এর কিছু গল্পের আইডিয়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ম্যাগাজিন এবং ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ।

পাঠ ও পরিচয়ের সুবিধার্থে গল্পগুলোকে দু'টি ভাগে সাজানো হয়েছে। মানুষ বিষয়ক গল্প এবং পশুপাখি বিষয়ক গল্প। সবশ্রেণীর পাঠকের দিকে খেয়াল রেখে প্রতিটি গল্পের শেষে অল্প কথায় শিক্ষাও সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য তরুণ লেখক অনুবাদক মাওলানা শামসুদ্দীন সাদী'কে ধন্যবাদ। আর গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য দেশের অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আনোয়ার লাইব্রেরী'র স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আনোয়ার হোসাইন-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার শ্রম ও সময় কবুল করুন।

বিনয়াবনত

মুনীরুল ইসলাম

খামারগ্রাম, বাংগরা, কুমিল্লা।

তারিখ : ১২ অক্টোবর ২০১৬

সূচিপত্র

মানুষ বিষয়ক গল্প [০৯–৭৬]

পাঁঠার বুলি–'ব্যা'/০৯, বালিকা বনাম নাস্তিক/১১
মিথ্যার পরিণাম/১২, ঘোড়ার ছায়া/১৩
বালক ও আপেল গাছ/১৪, রাজার দুধের পুকুর/১৬
বোকা রাখাল/১৭, আজব চাকরি/১৮
স্বার্থপর ফেরিওয়ালা/১৯, ভণ্ডামীর সুযোগ/২০
চোখের ডাক্তার/২২, আগুন দেখে উদ্ধার/২৩
ভবিষ্যৎ ভেঙে চূর্ণ!/২৪, বোকা চাষী/২৭
বাসর রাতে বিড়াল মারা/২৭, প্রকৃত বন্ধু/২৯
কাপুরুষের বীরত্ব!/৩০, স্পর্শের বদলে স্পর্শ/৩১
আলেকজান্ডারের তিন ইচ্ছা/৩২, বীরবলের বেহেশত যাত্রা/৩৩
বিপদে পড়লে/৩৬, চামড়ার দুর্গন্ধ/৩৭
একজন প্রজার সাহসিকতায়/৩৭, পথিক ও বটগাছ/৪০
মুচি যখন ডাক্তার/৪১, পুকুরের পানির হিসাব/৪২
হায়াতের বাগান/৪৩, স্বপ্ন হলো সত্যি/৪৪
রাঁধুনির কাছে রাজার পরাজয়/৪৫, দুখের ভাগ/৪৮
ভণ্ডপীরের কেরামতি/৪৮, চাষীর কুঁড়ে ছেলেরা/৪৯
অবিশ্বাসী বন্ধু!/৫০, কম সুখ বেশি সুখ/৫১
তেতো ফল মিষ্টি!/৫২, ছোট চোর বড় চোর/৫৩
উপস্থিত বুদ্ধি/৪৪, দর্জী চেহ্ শক/৫৫
দিল কলাপড়া হলো কপালপোড়া/৫৬, অন্যায়ের প্রশ্রয়ে/৫৭
লোভের পরিণতি/৫৮, ঠাণ্ডা-গরম/৬২
নাস্তিক নাপিত ও মুসলমান/৬৩, সম্পদের সঠিক বণ্টন/৬৪
সেদিনের জবাব/৬৬, বোকার হাড্ডি/৬৭
বিরানী বাজার/৬৯, গল্পের আসর/৭১
ডাক্তারের সংখ্যা বেশি/৭৩, দরবেশ ও নারী/৭৫

[চলমান...]

পশুপাখি বিষয়ক গল্প [৭৭-১২৮]

অতি চালাকের গলায় দড়ি/৭৭, অনৈক্যের পরিণাম/৭৯
সিংহ, শুয়োর ও শকুনি/৮১, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?/৮২
শিয়াল ও কাকের ফেসবুক/৮৩, শিয়াল ও কুকুরের বন্ধুত্ব/৮৪
যথার্থ প্রতিশোধ/৮৭, ফর্সা হওয়ার স্বপ্ন/৮৮
ছোট'র কাছেই পরাজয়/৮৯, ইঁদুর ও সিংহের উপকার/৯০
মশাদের সমাবেশ/৯১, অল্প বিদ্যা ভয়ংকর/৯৩
ক্ষমতার বড়াই/৯৪, শিকারী কুকুর/৯৫
ছোট মুখে বড় কথা/৯৬, বিশ্বাসঘাতক নেকড়ে/৯৭
ছায়া দেখে আত্মগর্ব/৯৮, অহংকার পতনের মূল/৯৯
শহুরে ইঁদুর ও মেঠো ইঁদুর/১০০, সেয়ানে সেয়ানে/১০১
নিজেই পড়লো ফাঁদে/১০২, কুকুরের মমতা/১০৩
চালাক শিয়াল ও বোকা ছাগল/১০৪, খরগোশের গবেষণা/১০৫
ভিন্নবেশের পরিণতি/১০৬, নতুন অভিজ্ঞতা/১০৭
ধূর্ত শিয়াল ও মরা হাতি/১০৮, গাছ ও কুড়ালের আলাপ/১১০
ইঁদুর ও ব্যাঙের বন্ধুত্ব/১১১, পিঠ যখন দেয়ালে/১১২
প্রতিপক্ষের কূটচাল/১১২, শিয়ালের চালাকি/১১৩
বাঁদরের বাঁদরামি/১১৫, শিয়ালের কৃপণতা/১১৬
ঝগড়ার পরিণাম/১১৭, ব্যাঙের অহংকার/১১৮
কচ্ছপের বোকামী/১১৯, খেঁকশিয়ালের ভাগ্য/১২১
ধৈর্যের ফল/১২১, শক্তিশালী বাঘ ও দুর্বল সারস/১২২
অত্যাচারী বিড়াল/১২৩, কুমির ও বানর/১২৪
অত্যাচারী মোরগরাজ/১২৫

পাঁঠার বুলি–'ব্যা'

এক সময় ধনী মহাজনদের কাছ থেকে গরিব চাষীরা ঋণ নিত। তা নির্দিষ্ট সময়ে সুদসহ ফেরত দিত। এমনই একজন গরিব চাষীর গল্প। তার নামে মহাজন আদালতে নালিশ করেছে। বেচারা কবে তার কাছ থেকে পঁচিশ টাকা নিয়েছিল, সুদে-আসলে তা-ই এখন পাঁচশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষী অনেক কষ্টে একশো টাকা জোগাড় করেছে। কিন্তু মহাজন বলছে, পাঁচশো টাকার এক পয়সাও কম হবে না, দিতে না পারলে জেলের ডালপানি খেতে হবে।

চাষীর বুঝি আর রক্ষা নেই। সে এ ব্যাপারে ভাবছিল। এমন সময় একজন উকিল এসে বললো, ঐ একশো টাকা আমাকে দিলে, তোমার বাঁচার উপায় বের করতে পারি, তখন তোমার পাঁচশো কেন, কোনো টাকাই দিতে হবে না।

চাষী তার হাতে-পায়ে ধরে বললো, উকিল সাব! দয়া করে আমাকে বাঁচিয়ে দিন, আমি আপনাকে ঐ একশো টাকা দিয়ে দিব।

উকিল বললো, তবে শোনো আমার ফন্দি বলি। যখন আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তুমি কোনো কথাই বলবে না। যে যা খুশি বলুক, গাল দিক আর প্রশ্ন করুক, তুমি তার জাবাব দেবে না, শুধু পাঁঠার মতো 'ব্যা' করবে। তা যদি করতে পার, তাহলে আমি তোমাকে খালাস করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

চাষী বললো, আপনি কর্তা, যা বলেন তাতেই আমি রাজি।

শুরু হলো এজলাস। হাকিম তার চেয়ারে বসা। বর্তমানে যাকে আমরা বিচারক বলে জানি। আদালতে মহাজনের মস্ত উকিল চাষীকে এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি সাত বছর আগে পঁচিশ টাকা ঋণ নিয়েছিলে?

চাষী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ব্যা'।

উকিল বললো, খবরদার! বলো নিয়েছিলে কিনা।
চাষী বললো, 'ব্যা'।
উকিল বললো, হুজুর! আসামীর বেয়াদবি দেখুন।
হাকিম রেগে বললেন, আবার যদি এমন করিস, তোকে আমিই জেলে দেব।
চাষী অনেক ভয় পেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'ব্যা ব্যা'।
হাকিম বললেন, লোকটা কি পাগল নাকি?
তখন চাষীর উকিল উঠে বললো, হুজুর! সে কি আজকের পাগল, সে তো বহুকালের পাগল, সে জন্ম থেকেই পাগল। তার কি কোনো বুদ্ধি আছে, না কাণ্ডজ্ঞান আছে? সে আবার ঋণ নিবে কি! এই হতভাগা মহাজনটার কাণ্ড দেখুন তো! ইচ্ছা করে জেনেশুনে পাগলটাকে ঠকিয়ে নেওয়ার মতলব করেছে। আরে, তার কি মাথা ঠিক আছে? তারা বলেছে, এইখানে একটা আঙ্গুলের টিপ দে। পাগল কী জানে, সে অমনি টিপ দিয়েছে। এই তো ব্যাপার!
তখন দুই উকিলের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। হাকিম খানিক শুনে-টুনে বললেন, মোকদ্দমা ডিসমিস।
সবাই আদালতের বাইরে চলে এলো। মহাজন তো অবাক! সে বাইরে এসে চাষীকে বললো– আচ্ছা, না হয় তোর চারশো টাকা ছেড়েই দিলাম, ঐ একশো টাকাই দে।
চাষী বললো, 'ব্যা'।
মহাজন যতই বলে, যতই বোঝায়, চাষী তার পাঁঠার বুলি কিছুতেই ছাড়ে না। মহাজন রেগেমেগে বলে গেল, দেখে নেব আমার টাকা তুই কেমন করে হজম করিস।
চাষী তার পোঁটলা নিয়ে গ্রামের পথ ধরেছে। এমন সময় তার উকিল এসে ধরলো, যাচ্ছ কোথায় বাপু? একশো টাকায় রফা হয়েছিল, মামলা তো জিতিয়ে দিলাম। এখন আমার পাওনাটা আগে চুকিয়ে যাও।
চাষী উকিলের মুখের দিকে তাকিয়েও বললো, 'ব্যা'।
উকিল বললো, বাপু হে, ওসব চালাকি খাটবে না, টাকাটা এখন বের করো।
চাষী বোকার মতো মুখ করে আবার বললো, 'ব্যা'।

উকিল তাকে নরম গরম অনেক কথাই শোনালো, কিন্তু চাষীর মুখে শুধু ঐ এক জবাব–'ব্যা'! তখন উকিল বললো, হতভাগা চাষা মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে ভূত, তোর পেটে এত শয়তানি কে জানে! আগে যদি জানতাম তাহলে পোঁটলাসুদ্ধ টাকাগুলো আটকে রাখতাম।

শিক্ষা : চাষীদের কাছ থেকে মহাজনদের এমন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেওয়া ছিল মারাত্মক অন্যায়। আর এভাবে মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে মামলা জেতাও বৈধ নয়।

বালিকা বনাম নাস্তিক

এক জ্ঞানী নাস্তিক ভ্রমণের ইচ্ছায় বিমানে চড়লেন। তিনি দেখলেন, তার পাশের সিটে বসে এক রূপবতী বালিকা মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে। নাস্তিক অনেক খুশি হলেন। এই বালিকার সঙ্গে গল্প করে ভ্রমণের সময়টুকু আনন্দে কাটাতে পারবেন ভেবে তিনি পুলকিত হলেন।

নাস্তিক গলা খাকারি দিয়ে বালিকাকে বললেন, তুমি কি আকাশ ভ্রমণের সময়টুকু গল্প করে কাটাতে চাও? এতে সময় দ্রুত কেটে যাবে।

বালিকা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে উত্তর দিল, আপনি কী বিষয়ে গল্প করতে চান?

নাস্তিক একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, না মানে,...এ্যা...এই ধর...এ্যা...সৃষ্টিকর্তা বলে কারো অস্তিত্ব নেই, বেহেশত নেই, দোজখ নেই, মৃত্যুর পরে কোনো জীবন নেই– এইসব বিষয়ে আরকি।–কথাটি বলে নাস্তিক কাষ্ঠ হাসি হাসলেন।

বালিকা বললো, ওকে ঠিক আছে, আপনার গল্পের বিষয়বস্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

–কী প্রশ্ন?–নাস্তিক সাগ্রহে জানতে চাইলেন।

বালিকা বললো– ছাগল, গরু, ঘোড়া এরা সবাই ঘাস খায়, কিন্তু ছাগলের হাগু ছোট ছোট গুটি টাইপ, গরুর হাগু একথাল কাদার মতো, আবার

ঘোড়ার হাগু বেশ শক্ত এবং লম্বাটে সাইজের, একই খাবার খাওয়ার পরও এদের হাগুর ধরন ভিন্ন কেন? এই বিষয়ে আপনার কী ধারণা?
নাস্তিক বালিকার এমন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উত্তর দিলেন, আমার এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।
বালিকা বললো, এই সাধারণ বিষয়টাই আপনি জানেন না, এরপরও কি আপনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিষয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করেন?–এই বলে বালিকা আবার বই পড়তে শুরু করলো। বালিকার এমন কথা শুনে নাস্তিকের দ্বিতীয় বারের মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় রইলো না।

শিক্ষা : যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

মিথ্যার পরিণাম

এক স্বার্থপর লোকের গল্প। অন্যের সম্পদে ভাগ বসানোর জন্য সে সব সময় সুযোগ খুঁজতো। কিন্তু সে তার নিজের সম্পদের এক আনাও কাউকে দিত না। তার বন্ধুদেরকেও না, গরিবদেরকেও না। একদিন লোকটি রাস্তায় তার ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা হারিয়ে ফেললো। তার এক বন্ধু এই স্বর্ণমুদ্রা হারানোর কথা শুনলো। সে আবার ছিল খুব দয়ালু। ঘটনাক্রমে বন্ধুটির মেয়ে এই ত্রিশটি স্বর্ণমদ্রা কুড়িয়ে পেল। সে বাড়িতে ফিরে এই কথা জানালে তার বাবা বললো, এটা তার বন্ধুর হারিয়ে যাওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রা হতে পারে। তাই সে মুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দিতে তার বন্ধুর কাছে গেল। কিন্তু তার স্বার্থপর বন্ধুটি যখন শুনলো, তার মেয়ে এই মুদ্রা কুড়িয়ে পেয়েছে, তখন সে বললো, ত্রিশটি নয় আমার মোট চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই এখান থেকে দশটি মুদ্রা সরিয়ে ফেলেছে। আমাকে তোমার চল্লিশটি মুদ্রাই দিতে হবে।
একথা শুনে লোকটি রেগে গিয়ে মুদ্রাগুলো সেখানে রেখে চলে এলো। কিন্তু বন্ধুটি তো ছিল অনেক লোভী ও স্বার্থপর। সে উল্টো বিচার নিয়ে

গেল আদালতে। বিচারক তার অভিযোগ মন দিয়ে শুনলেন এবং সেই বাবা ও মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। তাদের নিয়ে আসা হলে বিচারক মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, মা তুমি কয়টি মুদ্রা পেয়েছিল?
মেয়েটি জানালো, আমি ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি।
বিচারক আবার স্বার্থপর লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কয়টি মুদ্রা হারিয়েছিলে?
লোকটি বললো, আমি মোট চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা হারিয়েছি।
বিচারক এবার লোকটিকে জানালেন, মেয়েটি যে মুদ্রা কুড়িয়ে পেয়েছে সেগুলো তোমার নয়। কারণ মেয়েটি পেয়েছে ত্রিশটি মুদ্রা, আর তুমি হারিয়েছ চল্লিশটি মুদ্রা।
বিচারক মেয়েটিকে মুদ্রাগুলো নিয়ে চলে যেতে বললেন। এটাও বললেন, যদি কেউ জানায় যে ত্রিশটি মুদ্রা হারিয়েছে, তাহলে তোমাকে আবার খবর দেব। আর লোকটিকেও বললেন, কেউ যদি খবর দেয়, সে চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছে, তাহলে তোমাকেও খবর দেওয়া হবে।
তখন স্বার্থপর লোকটি স্বীকার করলো, হুজুর! আমি মিথ্যা বলেছি, আসলে আমি ত্রিশটি মুদ্রাই হারিয়েছিলাম। দয়া করে আমাকে মুদ্রাগুলো দিয়ে দিন।
বিচারক তার কোনো কথাই শুনলেন না। তিনি তার চেয়ার ছেড়ে ওঠে গেলেন।

শিক্ষা : সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে।

ঘোড়ার ছায়া

এক দেশে এক ব্যক্তির একটা ঘোড়া ছিল। লোকটি ঐ ঘোড়া ভাড়া দিয়ে সংসার চালাতো। গ্রীষ্মকালে একদিন একটা লোক পথ চলতে চলতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লো। সে তখন ঐ ঘোড়াটা ভাড়া করলো। ঘোড়া ভাড়া করে তার উপরে কিছুক্ষণ চড়লো। এক সময় প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে ঘোড়া থেকে নেমে তার ছায়ায় বসলো। তা দেখে ঘোড়ার মালিক

এগিয়ে এসে বললো, একি! তুমি আমার ঘোড়ার ছায়ায় বসেছ কেন? সরো সরো, আমার ঘোড়ার ছায়ায় আমি বসবো।
যে ঘোড়া ভাড়া নিয়েছিল সে বললো, বাহ্ রে সারাদিনের জন্য আমি তোমার ঘোড়া ভাড়া নিয়েছি, আমি বসবো না তো ছায়ায় তুমি বসবে?
ঘোড়ার মালিক বললো, ঘোড়া তোমায় ভাড়া দিয়েছি ঠিকই, কিন্তু ছায়াতো ভাড়া দেইনি!
এমনি দু'জন কথা কাটাকাটি করতে করতে শেষে মারামারি শুরু করলো। আর সেই ফাঁকে ঘোড়া সেখান থেকে দিল ছুট। এরপর অনেক খুঁজেও ঘোড়াটির খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘোড়াও হারালো ঘোড়ার ছায়াও হারালো।

শিক্ষা : তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাতামাতির কারণে অনেক সময় মূল্যবান জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায়।

বালক ও আপেল গাছ

অনেক দিন আগের কথা। এক ছিল আপেল গাছ। আর ছিল একটি শিশু। গাছটির সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল। গাছটিও ছেলেটিকে অনেক ভালোবাসতো। প্রতিদিন শিশুটি গাছটির কাছে বসে খেলতো ঘুমাতো। আবার খিদে পেলে এই গাছের ফলই খেত। শিশুটিকে খেলতে দেখে গাছটি অনেক আনন্দ পেত।
এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। শিশুটি বালক হলো। একদিন শিশুটি মন খারাপ করে গাছটির কাছে এলো। গাছটি তাকে বললো, এসো আমার সঙ্গে খেলা করো।
বালকটি বললো, আমি কি এখনো শিশু আছি। আমি বড় হয়েছি না! আমার কিছু বড় খেলনা লাগবে। সেগুলো কিনতে টাকা লাগবে।
গাছটি বললো, আমার কাছে তো টাকা নেই। তবে তুমি এক কাজ করতে পার। আমার আপেলগুলো ছিঁড়ে নাও। সেগুলো বাজারে বিক্রি করলে কিছু টাকা পাবে। তা দিয়ে খেলনা কিনতে পারবে।

বালক গাছ থেকে অনেক আপেল পেড়ে বাজারের দিকে রওনা করলো। তার মনে আনন্দ আর ধরে না।

এরপর অনেকদিন হয়ে গেল বালক আর গাছের কাছে আসে না। বালকের কথা মনে করে গাছের খুব খারাপ লাগে। মন ভার হয়ে থাকে।

হঠাৎ একদিন বালককে দেখা গেল। এখন সে আর বালক নেই। পরিপূর্ণ যুবক হয়ে গেছে। দেহ হয়েছে সুঠাম। যুবককে দেখে গাছের মনে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। গাছ আবার সেই পুরনো কথা বললো, আমার সঙ্গে খেলবে? একটু সময় দিবে আমাকে?

যুবক বললো, আমার হাতে সময় নেই। আমার এখন বড় পরিবার। তাদের জন্য ঘর বানাতে হবে। তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি আমাকে সহযোগিতা করতে পারবে?

গাছ বললো, আমার কাছে তো কোনো ঘর নেই। তুমি এক কাজ করো। আমার ডালপালাগুলো কেটে নিয়ে যাও। এসব দিয়ে ঘর বানাও গিয়ে।

যুবক মনের সুখে গাছের সব ডালপালা কেটে নিয়ে গেল।

এবারও দীর্ঘদিনের জন্য যুবককে আর দেখা গেল না। তার দীর্ঘ বিরহে গাছটি আবারো শোকে কাতর হয়ে পড়লো আর তার অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলো।

একবার খুব গরমের মৌসুমে গাছটি দেখতে পেল সেই যুবক আসছে। এখন সে পৌঢ়। তার অঙ্গে অঙ্গে বয়সের চিহ্ন। তাকে দেখতে পেয়ে গাছটি অনেক খুশি হলো। গাছটি আবারো তাকে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করলো।

তখন লোকটি কর্কশ কণ্ঠে বললো, আমি তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে আসিনি। এখন আমার অনেক বয়স হয়েছে। আমি একটি নৌকা দরকার। প্রশান্তির জন্য নৌকায় করে সমুদ্র ভ্রমণ করবো। আমাকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারবে বলো।

গাছটি বললো, আমার মোটা ডালটি কেটে নাও। তা দিয়ে সুন্দর নৌকা হবে।

লোকটি গাছের ডাল কেটে সুন্দর নৌকা বানিয়ে সমুদ্র বিলাসে চলে গেল। গাছটি সব হারিয়ে বসে রইলো।

অনেক দিন পর আবার তাকে দেখা গেল। এখন সে বার্ধক্যের শিকার। সে অনেক কষ্টে গাছের কাছে গিয়ে বসলো। গাছকে সে বললো, আমার একটু প্রশান্তি চাই।

গাছটি বললো, আমার মধ্যে আর আপেল ধরে না যে তোমায় আপেল দিব। আমার তাজা ডালগুলোও নেই যে তা দিয়ে তুমি একটি নতুন ঘর বানাবে।

বৃদ্ধ বললো, আমার ওসব চাই না। ওসব করার সামর্থ্যও নেই এখন। আমি একটু শান্তি চাই। জীবনের এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমি অনেক ক্লান্ত শ্রান্ত।

গাছটি বললো, আমার কাছে এখন কয়েকটি শুকনো ডাল আছে। এগুলোতে কোনো রকম বসতে পারবে।

বৃদ্ধ লোকটি বৃদ্ধ গাছটির বৃদ্ধ ডালগুলোতে বসে অনাবিল শান্তি লাভ করতে লাগলো। গাছটিও হৃদয়ে অনেক প্রশান্তি অনুভব করলো।

শিক্ষা : গাছটি হলো আমাদের পিতা-মাতার উদাহরণ। আসুন সময় থাকতেই তাদের সেবা করি। তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করি। তাদের ছোট বড় আবদারগুলো পূরণ করার চেষ্টা করি। আর সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি– রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা। হে আল্লাহ! তাদের ওপর রহম করুন যেভাবে তারা আমাকে ছোটকালে লালন-পালন করেছেন।

রাজার দুধের পুকুর

একবার এক রাজা তার লোকদের একটি দীঘি খনন করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী রাজার লোকেরা দীঘি খনন করলো। এরপর রাজা ঘোষণা করে দিলেন, রাজ্যের প্রতিটি ঘর থেকে এক গ্লাস করে দুধ নিয়ে আসতে হবে। আর রাতে তা দীঘিতে দিতে হবে। সকালে রাজা দেখতে চান তার দীঘি দুধ দিয়ে পূর্ণ হয়েছে।

রাজার এ নির্দেশ শুনে সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে এলো। এক লোক রাতে রাজার পুকুরে দুধ নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এমন সময় তার মাথায় এক চিন্তা এলো। সে ভাবলো, যেহেতু সবাই রাজার পুকুরে এক গ্লাস করে দুধ দিবে। আমি দুধের বদলে এক গ্লাস পানি দিলে কেউ ধরতে পারবে না। কারণ সবাই গভীর রাতে দুধ দেবে। রাতের অন্ধকারে আমি কী দিচ্ছি তা কেউ বুঝতে পারবে না । সবাই মনে করবে আমি দুধই দিচ্ছি। তাই আমি দুধের বদলে পানিই দেব।

রাতে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে এক গ্লাস পানি রাজার পুকুরে দিয়ে এলো। পরদিন রাজা তার দুধের পুকুর দেখতে এলেন। এসে দেখেন, একি! পুকুর পানিতে ভর্তি। দুধের কোনো চিহ্নও নেই।

আসলে প্রতিটি লোকই ভেবেছিল, সবাই তো দুধই দেবে, আমি পানি দিলে কী আর হবে! এমন করে সবাই দুধের বদলে পানিই দিয়েছিল। এভাবেই রাজার পুকুর পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল।

শিক্ষা : কোনো কাজ সফল করার জন্য অন্যের ওপর ভরসা না করে নিজের দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

বোকা রাখাল

এক ছিল রাখাল। ভেড়া চরানোই ছিল তার কাজ। একদিন সে বনে কয়েকটা নেকড়ের ছানা কুড়িয়ে পেল। সে খুশি মনে ছানাগুলোকে বাড়িতে নিয়ে এলো এবং যত্ন করে তাদের পুষতে লাগলো। রাখালের মনে আশা, এই নেকড়ের ছানাগুলো যখন বড় হবে তখন শুধু এরা তার ভেড়ার পালকেই পাহারা দেবে না, আমাকে অন্য ভেড়াও ধরে এনে দেবে।

নেকড়ের ছানাগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো। এক সময় যখন একেবারে বড় হয়ে গেল, তখন দেখা গেল হঠাৎ তার ভেড়াগুলোকে মেরে খেতে শুরু করেছে। এর পর থেকে রাখালের দিনের পর দিন ভেড়ার সংখ্যা কমতে লাগলো।

এসব দেখে রাখাল আফসোস করে বলতে লাগলো, আমার কৃতকর্মের ফল এটা। বড় অবস্থায় এদের সামনে পেলে দেখামাত্র শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। বাচ্চা অবস্থায় পেয়ে আমি এদের আদর করে কেন পুষতে গেলাম। কেন মেরে ফেললাম না আমি? আমি যে বড়ই বোকা।

শিক্ষা : অপাত্রে দয়া দেখাতে নেই।

আজব চাকরি

বিএ পাস করেও এক যুবক দীর্ঘদিন ধরে চাকরি পাচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন চিড়িয়াখানায় তার একটা চাকরি হয়ে গেল। চিড়িয়াখানার বাঘটা হঠাৎ করে মারা যাওয়ায় খাঁচাটা শূন্য পড়ে আছে। কর্তৃপক্ষ বললো, তুমি যদি খাঁচার ভেতর একটা বাঘের পোশাক পরে বাঘের মতো তর্জন-গর্জন দিতে পার, তাহলে মাসে পনেরো হাজার টাকা পাবে। অগত্যা বেকার ছেলেটা এতেই রাজি হলো।

প্রতিদিন চিড়িয়াখানা খোলার আগে সে বাঘের পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকে পড়ে। দর্শক এলে তাদের তর্জন-গর্জন ও আরো নানা কায়দা-কসরত দেখিয়ে আনন্দ দেয়। দেখতে দেখতে চিড়িয়াখানার দর্শক বেড়ে গেল। বাঘের খাঁচার সামনে বিরাট ভিড়। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষও খুশি হয়ে বেতন বাড়িয়ে দিল।

ভালোই চলছিল দিন। হঠাৎ একদিন হলো বিপত্তি। বাঘের খাঁচার পাশেই ছিল সিংহের খাঁচা। দুই খাঁচার মধ্যে একটা লোহার জালের বেড়া। একদিন সেই বেড়া ধরে লাফিয়ে নেচে-কুদে মজা দেখাতে গিয়ে পুরনো বেড়া ভেঙে সে গিয়ে পড়লো সিংহের খাঁচার ভেতর।

এখন কী হবে? প্রাণটা বুঝি আজ সিংহের হাতেই গেল। ভয়ে জবুথবু হয়ে খাঁচার এক কোণে বসে দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলো বেচারা।

এদিকে সিংহটাও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে লাগলো তার দিকে। ভয়ে তো তার

প্রায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জোগাড়। এদিকে সিংহটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে ছেলেটা যখন উঠে দাঁড়ালো, ঠিক তখন সিংহটা বলে উঠলো– ভাই, এত ভয় পাবেন না, আমিও বাংলায় অনার্স।

শিক্ষা : জীবিকার তাগিদে মানুষ কত চাকরিইনা করে।

স্বার্থপর ফেরিওয়ালা

একবার এক লোক দেবতা হারমিসের একটা কাঠের মূর্তি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে এলো। কিন্তু মূর্তিটা বিক্রি হলো না। কেউই কিনলো না সেটা। লোকটি তখন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশ জোর গলায় বলতে শুরু করলো, বন্ধুগণ! আজ আমি যে দেবতার মূর্তি বিক্রি করতে এসেছি, তিনি সর্বকালের সব মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। সবার দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। সমৃদ্ধি এনে দেন। তাঁকে আপনারা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে ঘরে স্থাপন করুন। এতে আপনাদের সার্বিক কল্যাণ হবে।

হঠাৎ এক পথিক এসব শুনে বলে উঠলো, তাই যদি হয় তাহলে তুমি এই মূর্তি বিক্রি করতে এনেছ কেন? বিক্রি না করে ঘরে রাখলেই তো বুদ্ধির কাজ করতে। এই মূর্তির সাহায্যে তোমার অনেক লাভ হতো, সার্বিক কল্যাণ হতো!

মূর্তি বিক্রেতা উত্তর দিল, আমার যে নগদ অর্থের দরকার ভাই, আর তা জোগাড় করে দিতে তার অনেক সময় লাগে। বিক্রি না করে উপায় কী?

শিক্ষা : মানুষ নিজেরটা ষোল আনা বোঝে।

ভণ্ডামীর সুযোগ

নাজিমুদ্দিন ছিল এক ব্যবসায়ীর ছেলে। বাপের অনেক সম্পত্তি সে পেয়েছিল। তাঁর ঝোঁক ছিল ভোগবিলাসের দিকে। কিন্তু ব্যবসা এমন একটা জিনিস যা করতে হলে ভোগবিলাসে গা ভাসানোর সময় থাকে না। ফলে নাজিমুদ্দিনের কিছুদিনের মধ্যেই বিরক্তি জাগলো। সে ভাবলো, এতো কষ্ট করে ব্যবসা না করে জুয়া খেলে টাকা রোজগার করবে।

নাজিমুদ্দিন আস্তে আস্তে ব্যবসা ছেড়ে চুটিয়ে জুয়া খেলা শুরু করলো। খেলতে খেলতে সে যেমন মোটা টাকা হারতো আবার তেমনি জিততোও। কিছুদিন এইভাবে চলার পর একদিন হঠাৎ সে সব ধনসম্পত্তি খুইয়ে রাস্তার ভিখারী হয়ে গেল।

এই ঘটনার ফলে নাজিমুদ্দিনের মনে জীবনের প্রতি বিরক্তি জাগলো। তার আর ইচ্ছা করলো না সমাজে বাস করতে। সে হিংস্র প্রাণীর কথা ভেবে, জীবনের মায়া ছেড়ে জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালো। কিছুকাল পরে তার চুল দাড়ি বেড়ে গেল, চুলে জট ধরলো। তাকে তখন ঠিক একটা পাগলের মতো দেখাচ্ছিল।

অদূরে বহু জঙ্গলবাসী ছিল। সে বছর ফসল না হওয়ায় তারা দূরে দূরে গিয়ে শিকার করতে শুরু করলো। হঠাৎ তাদের নজর পড়লো নাজিমুদ্দিনের ওপর। তার বিরাট দাড়ি-গোঁফ দেখে তারা অবাক হলো। তারা আরো অবাক হলো নাজিমুদ্দিনের কাছে কোনো অস্ত্র না দেখে। যে বনে এতো বাঘ-ভালুক, সেখানে নিরস্ত্র মানুষকে দেখে তাদের অবাক হওয়ারই কথা। তারা ভাবলো, তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন, আল্লাহর কোনো ওলী হবেন নিশ্চয়। তারা তাকে শ্রদ্ধাভরে সালাম করলো। তখন তাদের দিকে তাকিয়ে নাজিমুদ্দিন হাসি হাসি মুখে বললো, কী চাও তোমরা?

–'আপনি আমাদের আস্তানায় এলে আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে।' তারা বললো।

কথা না বাড়িয়ে নাজিমুদ্দিন তাদের ডেরায় চলে গেল। নাজিমুদ্দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিন বাদে মুষলধারে বৃষ্টি হলো। জঙ্গলবাসীরা ভাবলো, এটা নাজিমুদ্দিন শাহ'র মাহাত্ম্যের ফলে হয়েছে। ভালো বৃষ্টি হওয়ায় সে বছর

এলাকায় ভালো ফসল হয়েছিল। তার ফলে জঙ্গলবাসীর ঘরে ঘরে আনন্দ দেখা দিল। সে দেশের রাজার সঙ্গে জঙ্গলবাসীর বিবাদ ছিল। তাদের সব সময় রাজা দাবিয়ে রাখতেন। রাজার কানে গেল যে জঙ্গলবাসীর অবস্থা ভালো হচ্ছে। তিনি তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য বিরাট সেনাবাহিনী পাঠালেন। এদিকে জঙ্গলবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারা যেহেতু একজন মহাপুরুষকে তাদের কাছে পেয়ে গেছে, সেহেতু তারা হেরে যেতে পারে না। তাই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজার সেনাবাহিনীকে তারা হটিয়ে দিল।

রাজার সেনাবাহিনী হেরে যাওয়ায় রাজা খুব অবাক হলেন। তিনি কারণ জানতে গুপ্তচর পাঠালেন। গুপ্তচর ফিরে এসে মহাপুরুষের আগমনের কথা জানালো। শুনে রাজারও বিশ্বাস হলো, নিশ্চয় কোনো মহাশক্তি জঙ্গলবাসীকে সাহায্য করছে। তাই তিনি ভাবলেন, জঙ্গলবাসীকে জব্দ করার আগে ঐ মহাপুরুষকে তাদের বশে আনা দরকার। রাজা গোপনে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে তার রাজ্যে আসার আহ্বান জানালেন। নাজিমুদ্দিন ভাবলো, এমন গহীন জঙ্গলে থাকার চেয়ে রাজার অধীনে থাকলে তার অনেক উন্নতি হবে। তাই সে জঙ্গলবাসীকে না জানিয়ে সোজা রাজার কাছে চলে গেল। রাজা সাদরে তাকে গ্রহণ করলেন।

নাজিমুদ্দিন এই রাজার কাছে আসার দু-একদিনের মধ্যেই তার একটি কঠিন রোগ সেরে গেল। রাজা যথারীতি রোগ মুক্তির জন্য ডাক্তার-কবিরাজদের প্রশংসা করলেও মনে মনে তিনি বুঝিয়েছেন, এটা নিশ্চয়ই এই মহাপুরুষ নাজিমুদ্দিন শাহ'র মহিমা। রাজা নাজিমুদ্দিন শাহ'র জন্য একটি বাড়ি তৈরি করলেন।

দেখতে দেখতে রাজার কাছাকাছি যারা থাকে তারাও নাজিমুদ্দিন শাহ'র ভক্ত হয়ে গেল। নাজিমুদ্দিন অবস্থা বুঝে দু'চারটি করে কথা বলতো। রাজধানীর মতো ধনবহুল স্থানে মহাপুরুষ সেজে থাকা যে কত কষ্টকর তা সে কিছুদিনের মধ্যেই হাড়ে হাড়ে টের পেল। কিছুদিন পরে ঐ রাজার সঙ্গে নাজিমুদ্দিনের দেশের রাজার বিরোধ সৃষ্টি হলো। রাজা যুদ্ধে যাওয়ার আগে নাজিমুদ্দিনের কাছে এসে দোয়া চাইলেন। নাজিমুদ্দিন বাধ্য হয়ে

রাজার জয় লাভের দোয়া করলো। এভাবে নিজের দেশের পরাজয় কামনা করে মনে মনে দগ্ধ হলো। কিন্তু তখন এছাড়া তার কিছুই করার ছিল না। রাজা যুদ্ধে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করে ফিরে এলেন। ফেরার পথেই রাজা ঠিক করলেন, এবার নাজিমুদ্দিন শাহ'র আস্তানা বড় করবো। আরো ঘটা করে তার ওরস দেব। কিন্তু ফিরে এসে রাজা আর নাজিমুদ্দিন শাহ'র দর্শন পেলেন না। তারপর আর কেউ কোনোদিন এই নাজিমুদ্দিন শাহকে দেখেনি।

শিক্ষা : অনেক ক্ষেত্রে সরলপ্রাণ মানুষই ভণ্ডদেরকে ভণ্ডামীর সুযোগ করে দেয়। এ ব্যাপারে সবার সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

চোখের ডাক্তার

এক বৃদ্ধা মহিলার চোখে সমস্যা দেখা দিল। তাই তিনি এক চোখের ডাক্তারকে দেখাতে এলেন। এসে ডাক্তারকে বললেন, ডাক্তার সাহেব, দয়া করে আমার চোখের চিকিৎসা করুন। আমার চোখ সেরে গেলে আপনাকে দামি উপহার দেব। তবে আমাকে আমার বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

ডাক্তার বললেন, ঠিক আছে, আপনি আজ বাড়ি চলে যান, কাল থেকে আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার চোখের চিকিৎসা করবো।

পরদিন ডাক্তার সাহেব বৃদ্ধার বাড়িতে এসে দেখলেন তার ঘর নানা মূল্যবান জিনিসে ভর্তি। ঘরে আর কেউ থাকে না। বৃদ্ধা একা। এসব ভেবে ডাক্তারের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। ডাক্তারের বেশ লোভ হলো। এরপর থেকে তিনি প্রায় রোজই আসতে লাগলেন, এসে বৃদ্ধার চোখে একটা মলম লাগিয়ে বলেন, এবার আপনাকে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে।

বৃদ্ধা চোখ বন্ধ করলে সেই ফাঁকে ডাক্তার বৃদ্ধার মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেন। দিনের পর দিন এমনি করেই বৃদ্ধার মূল্যবান জিনিসপত্র সব

যখন ডাক্তারের নেওয়া হয়ে গেল, তখন তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, আপনার চোখ এবার সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। এবার আমার বখশিশটা দিয়ে দিন। বৃদ্ধা বখশিশও দিলেন না এবং ডাক্তারের কথার কোনো উত্তরও দিলেন না।

ডাক্তার এবার বৃদ্ধার নামে আদালতে নালিশ করলেন। বিচারক তাকে আদালতে হাজির করে বললেন, চোখ সারলে ডাক্তারকে বখশিশ দেবেন বলেছিলেন, এখন তা দিচ্ছেন না কেন?

বৃদ্ধা বললেন, চোখ তো আমার সারেনি হুজুর, বরং চোখ আমার আগের চেয়ে বেশি খারাপ হয়েছে।

বিচারক বললেন, তা কী করে বুঝলেন?

বৃদ্ধা বললেন, ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা শুরু করার আগে আমার চোখের অবস্থা এমন ছিল যে, আমার ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র বেশ ভালোই দেখতে পেতাম। এখন আমি সেগুলোর একটিও আর দেখতে পাই না।

বিচারক বুঝতে পেরে ডাক্তারকে কঠিন শাস্তি দিলেন এবং তার জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

শিক্ষা : অপরাধ করলে একদিন ধরা পড়তেই হয়।

আগুন দেখে উদ্ধার

সমুদ্রের বুক চিরে চলছে একটি জাহাজ। এক সময় প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল জাহাজটি। জাহাজের বেঁচে যাওয়া এক যাত্রী ভাসতে ভাসতে এক নির্জন দ্বীপে এসে পৌঁছালো। জ্ঞান ফেরার পর প্রথমেই সে প্রাণখুলে আল্লাহর শুকরিয়া জানালো তার জীবন বাঁচানোর জন্য। জাহাজের আশায় প্রতিদিন সে দ্বীপের তীরে এসে বসে থাকতো। কিন্তু প্রতিদিনই তাকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হতো। এরই মধ্যে সে সমুদ্রতীরে তার জন্য একটা ছোট ঘর তৈরি করলো। সমুদ্রের মাছ ধরে এবং বন থেকে ফলমূল খেয়ে সে বেঁচে থাকলো।

এরই মধ্যে সে একদিন খাবারের খোঁজে বনের মধ্যে গেল। বন থেকে ফিরে এসে দেখলো, রান্না করার চুলা থেকে আগুন লেগে তার পুরো ঘরটিই ছাই হয়ে গেছে এবং তার কালো ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেছে। লোকটি অনেক কান্নাকাটি করে এক সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লো।
পরদিন সকালে এক জাহাজের আওয়াজে তার ঘুম ভাঙলো। জাহাজটি সেই দ্বীপের দিকে তাকে উদ্ধার করার জন্যই আসছিল। সে অবাক হয়ে বললো, 'তোমরা কিভাবে জানলে যে আমি এখানে আটকা পড়ে আছি!'
জাহাজের ক্যাপ্টেন জানালো, তোমার জ্বালানো ধোঁয়ার সংকেত দেখে।

শিক্ষা : আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো বান্দার ওপর ছোট বিপদ দিয়ে বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

ভবিষ্যৎ ভেঙে চূর্ণ!

এক শহরে বাস করতেন এক সওদাগর। সওদাগরের ছিল তেলের ব্যবসা। সওদাগরের পাশের বাড়িটি ছিল এক সরলমনা দরবেশের। দরবেশের বউ, ছেলেমেয়ে কেউ ছিল না। তার ধন-সম্পদ বলতেও তেমন কিছু ছিল না। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যা কিছু জুটতো তাই দিয়েই তিনি কোনোমতে জীবন কাটাতেন। দরবেশের সরলতা ও সত্যবাদিতার কারণে তার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও সম্মান দেখাতেন সওদাগর। তিনি এই দীনহীন দরবেশকে প্রায়ই সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। যখনই ব্যবসায় ভালো উপার্জন হতো কিংবা তেলের নতুন চালান আসতো, তখনই তিনি দরবেশের জন্য এক বোতল করে তেল পাঠিয়ে দিতেন। তেলের বোতল নেওয়ার পর দরবেশ ভাবতেন, নিশ্চয়ই এ তেলের ভাগ প্রতিবেশীরাও পেয়েছে, তাই আমার নেওয়া অন্যায় হবে না। তাছাড়া হাদিয়া নেওয়া জায়েয আছে। ভিক্ষা করা নাজায়েয। এসব ভেবে দরবেশ তেল গ্রহণ করতেন।
সওদাগর যে পরিমাণ তেল দিতেন তা ব্যবহারের পরও থেকে যেত। দরবেশ তা একটা মটকায় ঢেলে রাখতেন। এভাবে কিছুদিন পর দেখা গেল মটকাটি তেলে ভরে গেছে। তখন দরবেশ ভাবলেন, এতো তেল

দিয়ে আমি কী করবো? আমার তো বউ-পোলাপান নেই। তারচেয়ে অভাব-অনটনে আছে এমন কাউকে দিয়ে দিলেই ভালো হয়। কিন্তু এই মহল্লায় এমন কেউ তো নেই। এরপর দরবেশকে অন্য চিন্তা পেয়ে বসলো। তিনি ভাবতে লাগলেন– না, কাউকে এক মটকা তেল দান করে লাভ নেই। সে খেয়ে খেয়েই শেষ করে ফেলবে। তাছাড়া বিনামূল্যে বিনা পরিশ্রমে এতো তেল পেলে তার স্বভাব-চরিত্রও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর দান করা তারই সাজে যার আয়-উপার্জন আছে। আমার এমন কী আছে যে, দানের চিন্তায় মেতে উঠেছি! তাছাড়া আমারইবা বউ, ছেলেমেয়ে থাকতে অসুবিধা কি? আমিও তো আবার বিয়ে-শাদি করে সংসার গড়তে পারি। দান করার প্রয়োজন নেই। এ তেল বিক্রি করে যে আয় হবে তা দিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে দেই। যখন ব্যবসার অর্থ দিয়ে অনেক টাকা আয় হবে, তখন নিজেদের অভাব মিটিয়ে অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করবো।

দরবেশ বসে গেলেন আকাশকুসুম পরিকল্পনায়। মনে মনে হিসাব করলেন, মটকাতে প্রায় ত্রিশ কেজি তেল হবে। তা বাজারে বিক্রি করলে অনেক টাকা পাবো। এ টাকা দিয়ে প্রথমে ২০/৩০টি হাঁস-মুরগির বাচ্চা কিনবো। বছরখানেকের মধ্যে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে ডিম পাড়া ও বাচ্চা দেওয়া শুরু করবে, তখন আমি হাজারখানেক হাঁস-মুরগির মালিক হব। তখন সেগুলো বিক্রি করলে ১০/১৫টা দুম্বা কেনা যাবে। দুম্বা পোষা একদম সহজ কাজ। সেগুলো নিয়ে যাব মরুভূমি ও পাহাড়ে। শুধু লাঠি হাতে নেকড়ে পাহারা দেব। একহাতে লাঠি আর অন্যহাতে তসবিহ। ইবাদত-বন্দেগীও হবে, দুনিয়াদারীও চলবে। এভাবে বছর দু'য়েক কষ্ট করলেই যথেষ্ট। শত শত দুম্বায় বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে। এরপর দুম্বার দুধ থেকে দই, ঘি, পনির, মাখন ইত্যাদি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করবো। তাছাড়া দুম্বার পশমও খুব লাভজনক ব্যবসা। এসব করে আমি হয়ে যাব শহরের সবচেয়ে সেরা ধনী। এতো আয়-উপার্জনের কিছু অর্থ দিয়ে প্রথমে ঘরবাড়ি সাজাবো। কিছু ফলের বাগান কিনবো। ধনসম্পদ, বাড়িঘর, বাগবাগিচা দেখাশোনার জন্য কিছু চাকর-বাকরও রাখবো। আমি শুধু চাকর-বাকরকে নির্দেশ দেব আর তারা তা চোখের পলকে পালন করবে।

ধনসম্পদ হয়ে যাওয়ার পর নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকাতে হবে। শহরের সেরা অভিজাত পরিবারের একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করবো। বছরখানেকের মধ্যে একটা সুন্দর সন্তান জন্মাবে। সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক তাতে কিছু আসে যায় না। ধরে নিলাম আমার প্রথম সন্তান ছেলেই হলো। এরপর ছেলেকে মানুষ করার পালা। আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে তাকে খুব সাবধানে মানুষ করবো। অবশ্য ৬/৭ বছর বয়সে ছেলেটি স্বভাবতই একটু দুষ্টুমি করবে। তা করুক। দুষ্টুমি করাও বয়সের ধর্ম। ছেলেটি মাঝে মাঝে আবদার করবে রাখালদের সঙ্গে মাঠে যেতে। দুম্বার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করা বাচ্চাদের কাছে এক অদ্ভুত আনন্দের বিষয়। মুশকিল হলো ছেলেটি কোনো কোনো সময় বড় দুম্বাটির পিঠে চড়তে চাইবে। কিন্তু রাখাল বেটারা হয়তো তা পছন্দ করবে না। কারণ বড় দুম্বাটি কয়েকদিন পরই বাচ্চা দেবে। রাখাল যখন দেখবে আমার আদুরে ছেলেটি ঐ দুম্বার পিঠে চড়ে বসেছে, তখন ঐ বেটা মূর্খ তো শেষমেশ রেগে জ্বলে উঠবে। দৌড়ে এসে আমার ছেলের তুলতুলে পিঠে নেকড়ে মারার লাঠি দিয়ে আঘাত করবে। বেটার কত বড় সাহস! আমার ছেলের গায়ে লাঠিপেটা। দেখাচ্ছি তোর মজা। আমার গোলাম হয়ে আমার ছেলের গায়ে আঘাত! এই নে তোর পাওনা।

এই বলেই কল্পনাবিলাসী দরবেশ তার চৌকির পাশে রাখা মোটা লাঠি দিয়ে কল্পিত রাখালের গায়ে হানলো জোরসে আঘাত। বিকট শব্দে তার তেলের মটকা ভেঙে গেল। মাটির তৈরি মটকাটি ভেঙে তেল ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরে। ছিটকে এসে লাগলো তার শরীর ও মুখে। জিহবা দিয়ে মুখ চাটতেই তেলের স্বাদ পেয়ে সে কল্পনার আকাশকুসুম চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এলো বাস্তব জগতে। চোখ মেলে দেখলো, লাঠির আঘাতে রাখালের মাথা ফাটেনি, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে তার এতো দিনের তেলভরা মটকাটি। দরবেশ এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। সে বুঝতে পারলো, জীবনের বাস্তব পরিকল্পনা আর কল্পনার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

শিক্ষা : সামর্থ্যের বাইরে অবাস্তব পরিকল্পনা সাজিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং এতে ক্ষতিই রয়েছে।

বোকা চাষী

এক গ্রামে ছিল এক বোকা চাষী। তার গোয়াল ঘরে অনেক গরু ছিল। চাষী চাষবাস করে আর গরুর দুধ বিক্রি করে বেশ ভালোভাবেই সংসার চালাতো। একদিন হয়েছে কি! চাষীর গোয়াল ঘরে এক সিংহ ঢুকে পড়লো। চাষী সিংহটাকে ধরার জন্য গোয়াল ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। এদিকে সিংহটি যখন দেখলো, বন্ধ ঘর থেকে তার পালানোর কোনো উপায় নেই, তখন সে ভয়ংকর গর্জন করতে করতে গোয়ালের গরুগুলোকে মেরে ফেলতে লাগলো। চাষী যখন বুঝলো সিংহকে সে ধরতে পারছে না, আর মাঝখান থেকে শুধু তার গরুগুলো মারা পড়ছে, তখন সে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটি ছুটে বেরিয়ে গেল।

চাষী বউ এবার চাষীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কী! এতো গোলমাল কিসের?

চাষী ব্যাপারটা তার বউকে খুলে বললো। চাষীর বউ অমনি বলে উঠলো, যেমন আপনার বুদ্ধি তেমনই কাজ করেছেন আপনি। যে জন্তুকে দূরে দেখলে লোকে ভয়ে পালায়, দিশে হারায়, আর আপনি কিনা তাকে ধরবে মনে করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? এখন গরুগুলো সব মারা গেল। দরজা খোলা থাকলে একটা গরুও মারা পড়তো না।

শিক্ষা : বোকামীর দণ্ড এভাবেই দিতে হয়।

বাসর রাতে বিড়াল মারা

এক দেশের এক বাদশাহর ছিল দুই কন্যা। তার ছিল না কোনো পুত্র সন্তান। তাই রাজকন্যা দুইজন ছিল বাদশাহর অনেক অনেক আদরের। সব সময় দুই রাজকন্যার জন্য দশ-পনেরো জন দাসী প্রস্তুত থাকতো। কখন কোন রাজকন্যার কী দরকার হবে আর তারা হুকুম পালন করবে। দুই রাজকন্যারই একটা করে বিড়াল ছিল। বিড়াল দুটো ছিল তাদের সব

সময়ের সাথী। তারা খেতে বসলে এমনকি ঘুমাতে গেলেও বিড়াল দুটো সঙ্গে সঙ্গে থাকতো।

দেখতে দেখতে দুই রাজকন্যাই এক সময় বড় হয়ে উঠলো। তারা বিয়ের উপযুক্ত হলো। এরপর বাদশাহর চিন্তা বাড়তে লাগলো। কারণ এই দুই রাজকন্যার জামাইদের উপরেই তার এই বিশাল রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে। তাই এমন যোগ্য দুইজন ছেলে খুঁজে বের করতে হবে, যারা এই গুরুদায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবে।

সারা রাজ্যে অনেক খোঁজাখুঁজি করে এমন দুই ভাই পাওয়া গেল, যাদের কাছে রাজকন্যাদের বিয়ে দেওয়া যায় বলে বাদশাহর মনে হলো। তারপর অনেক ধুমধাম করে একসঙ্গেই বিয়ে হলো দুই রাজকন্যার। বিয়ের পর বাদশাহ দুই মেয়ে জামাইকে সমানভাবে রাজ্যের দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন।

দুই ভায়রা-ভাই রাজ্য পরিচালনা নিয়ে অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দুইজনের অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ করেই রাজ্যের একটা বড় অনুষ্ঠানে দুই ভাইয়ের দেখা হয়ে গেল। অনেক দিন পর দেখা হওয়ায় দুইজনই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লো। অনেক কথার এক পর্যায়ে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলো, ভাই! আপনি দাম্পত্য জীবনে কেমন সুখী?

বড় ভাই বললো– হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক সুখে আছি। রাজকন্যা আমাকে অনেক শ্রদ্ধা-সম্মান করে, আমার কথা মেনে চলে। আমাদের কোনোই সমস্যা নেই।

এসব শুনে ছোট ভাই আফসোস করে বললো, কিন্তু ছোট রাজকন্যা তো আমার কোনো কথাই শোনে না। সব সময় আমার সঙ্গে রাগারাগি ঝগড়াঝাটি করে। এমনকি মাঝে মাঝে গায়েও হাত তুলে। আপনি কিভাবে আপাকে বশ করলেন?

তখন বড় ভাই রাজকন্যার বিড়ালের ব্যাপারে জানতে চাইলো। ছোট ভাই বললো– জি, ঐ বিড়ালকে তো আমার চাইতেও বেশি পছন্দ করে, যত্নে রাখে।

বড় ভাই বললো, প্রথম দিন বাসর রাতে ঘরে ঢুকেই একটা তরবারি দিয়ে ঐ বিড়ালকে দিলাম এক কোপ। ব্যাস একেবারে দুই ভাগ। এই ঘটনায়

রাজকন্যা ভাবলো, আমি অনেক বড় বীর-বাহাদুর। এরপর থেকেই সে আমাকে অনেক ভয় করে চলে।
এই কথা শুনে ছোট ভাই মনে মনে ভাবলো, ঠিক আছে আজকে বাড়ি ফিরেই বিড়ালের জীবন শেষ করে ফেলবো।
অনেকদিন পর আবার দুই ভায়রা-ভাইয়ের দেখা। এবার ছোট ভাইয়ের শরীরে অনেক কাটা দাগ। বড় ভাই জিজ্ঞেস করলো– কি খবর, কোনো যুদ্ধে আহত হয়েছিলে নাকি?
ছোট ভাই বললো– না ভাই, আপনার বিড়াল মারার ঘটনা শুনে আমি সেদিন বাসায় গিয়ে এক কোপে বিড়ালটাকে দুই ভাগ করে ফেললাম। কিন্তু আমার বেলায় পরিণাম হলো উল্টো। আমাকে এর শাস্তিস্বরূপ একমাস কারাবন্দি জীবন আর অত্যাচার ভোগ করতে হলো।
তখন বড় ভাই বললো, বিড়াল বাসর রাতেই মারতে হয়, পরে মারলে কোনো লাভ নাই।

শিক্ষা : প্রথম দিন থেকেই স্ত্রীর কাছে সব বিষয়ে নিজের বাহাদুরি প্রকাশ করতে হয়।

প্রকৃত বন্ধু

দুই তরুণের মধ্যে প্রাণে প্রাণে বন্ধুত্ব ছিল। একদিন তারা বেড়াতে বেরোলো। ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা জঙ্গলের কাছে চলে এলো। তাদেরকে দেখে জঙ্গল থেকে হঠাৎ একটা ভয়ানক ভালুক বেরিয়ে এলো। ভালুকটাকে দেখে দুই বন্ধু অনেক ভয় পেয়ে গেল। তখন দুইজনের মধ্যে একজন ঝটপট একটা গাছে উঠে লুকিয়ে পড়লো। অপর বন্ধুটি গাছে উঠতে পারতো না। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।
বন্ধুটি তার কথা না ভেবে নিজের প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠে পড়েছে। এখন তাকে নির্ঘাত ভালুকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। অগত্যা কোনো উপায় নেই দেখে মরার ভান করে সে মাটিতে শুয়ে পড়লো। সে শুনেছিল ভালুকেরা নাকি মরা মানুষ খায় না। ভালুক এবার মাটিতে শোয়া তরুণের

একবারে কাছে এসে গেল। তরুণটি তখন শ্বাস বন্ধ করে মরার মতো পড়ে রইলো। ভালুকটি কিছুক্ষণ ঘ্রাণ সোঁকার পর তাকে মরা মনে করে সেখান থেকে চলে গেল।

ভালুকটা চলে যেতেই গাছেচড়া বন্ধুটি গাছ থেকে নেমে মাটিতে শোয়া বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো, ভালুকটা তোমার কানে কানে কী যেন বলে গেল, কী বললো ভাই?
বন্ধুটি ঝটপট উত্তর দিল, সে বলে গেল, যে বন্ধু তোমাকে বিপদের মুখে ফেলে পালায়, তাকে কোনোদিন বিশ্বাস করো না। তার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ো না। সে তোমার বন্ধু হতে পারে না...।

শিক্ষা : বিপদে পড়লে প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কাপুরুষের বীরত্ব!

এটা কোনো সাধারণ মানুষের গল্প নয়, সৈনিকদের গল্প। একবার দুইজন সৈনিক একসঙ্গে পথ চলছিল। যেতে যেতে তাদের সামনে পড়লো এক কুখ্যাত ডাকাত। ডাকাতকে দেখামাত্র একজন সৈনিক পালিয়ে গেল। আরেকজন ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে যখন তাকে ধরাশায়ী করে ফেললো, তখন যে সৈনিকটি পালিয়ে গিয়েছিল সে এগিয়ে এসে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বললো, দাঁড়াও আমি তাকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি। সে জানে না কাদের সঙ্গে লাগতে এসেছে।
এই কথা শুনে যে লড়াই করছিল সে বললো, তুমি এখন যা বলছো তা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। আগে শুনতে পেলে, তুমি খাঁটি কথা বলছো মনে করে আমি মনে আরো জোর পেতাম। এখন তুমি তোমার মুখ বন্ধ করে তোমার তলোয়ারটা খাপে ঢোকাও। ও দুটোর কোনোটারই আর প্রয়োজন নেই। যারা তোমাকে চেনে না–জানে না, তুমি বরং তাদের কাছে

গিয়ে বীরত্ব দেখাও। ডাকাত দেখে তুমি যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিলে তা দেখেই তোমার বীরত্ব আমি বুঝে নিয়েছি। এখন আর নতুন করে কী বীরত্ব দেখাবে!

শিক্ষা : কাপুরুষের মনোভাব থাকলে কখনো যোদ্ধা বা সৈনিক হওয়া যায় না। সৈনিক মানেই সাহসী।

স্পর্শের বদলে স্পর্শ

একদিন এক চাল বিক্রেতার কাছে এক মহিলা চাল কিনতে এলো। তখন দোকানে মানুষের আনাগোনা কম ছিল। চাল বিক্রেতা মহিলাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মধ্যে খারাপ চিন্তা জেগে উঠলো। সে মহিলার হাত ধরে বললো, ভেতরে গোডাউনে চলুন। সেখানে আরো ভালো মানের চাল আছে। মহিলা ঝেংটা মেরে তার হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

দিনশেষে চাল বিক্রেতা ঘরে ফিরে এলো। এসে দেখে তার স্ত্রী বসে কাঁদছে। স্ত্রীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী বললো, প্রতিদিন যে দুধ বিক্রেতা আমাদের দুধ দেয় সে আজ সকালে একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে। অন্যান্য দিন সে দরজায় নক করে। আমি দরজা খুলে আড়াল থেকে দুধের জগ দেই। সে দুধ দিয়ে জগ দরজায় রেখে চলে গেলে আমি তা নিয়ে আসি। আমিও তাকে দেখি না, সেও আমাকে দেখতে পায় না। কিন্তু আজ আমি দরজা খুলে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় সে দরজার বাইরে থেকে আমার হাত ধরে বসলো। এর আগে কখনো এমন কাজ করেনি। আজই প্রথম। তাই লজ্জায় অপমানে শুধু কান্না পাচ্ছে আমার।

স্ত্রীর কথা শুনে চাল বিক্রেতা শুধু এতটুকু বললো, স্পর্শের বদলে স্পর্শ। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করলে দুধ বিক্রেতাও তাই করতো।

শিক্ষা : সবারই মা বোন স্ত্রী কন্যা রয়েছে। পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টি দিলে নিজেদের মা-বোনেরাও পরপুরুষের কুদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে না।

আলেকজান্ডারের তিন ইচ্ছা

মৃত্যুশয্যায় মহাবীর আলেকজান্ডার তার সেনাপতিদের ডেকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার তিনটা ইচ্ছা তোমরা পূরণ করবে। আমার প্রথম ইচ্ছা হলো, শুধু আমার চিকিৎসকরাই আমার কফিন বহন করবেন। দ্বিতীয় ইচ্ছা হলো, আমার কফিন যে পথ দিয়ে গোরস্তানে নিয়ে যাবে সেই পথে আমার উপার্জিত সোনা-রুপাগুলো ছড়িয়ে রাখবে। আর তৃতীয় ইচ্ছা হলো, কফিন বহনের সময় আমার দুই হাত কফিনের বাইরে ঝুলিয়ে রাখবে।

সেনাপতি তখন এই বিচিত্র ইচ্ছার কারণ জানতে চাইলেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আলেকজান্ডার বললেন, আমি দুনিয়ার সামনে তিনটি শিক্ষা রেখে যেতে চাই।

প্রথমতঃ আমার চিকিৎসকদের কফিন বহন করতে এই কারণে বলেছি, যেন লোকেরা বুঝতে পারে, চিকিৎসকেরা কোনো মানুষকে সুস্থ করে তুলতে পারে না। তারা ক্ষমতাহীন আর মৃত্যুর ভয়ানক থাবা থেকে রক্ষা করতে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ গোরস্তানের পথে সোনা-দানা ছড়িয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে এটা বোঝানোর জন্য যে, সোনা-দানার একটা কণাও মানুষের সঙ্গে যাবে না। এগুলো পাওয়ার জন্য সারাটা জীবন ব্যয় করেছি কিন্তু নিজের সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারছি না। মানুষ বুঝুক এসবের পেছনে ছোটা সময়ের অপচয়।

তৃতীয়তঃ কফিনের বাইরে আমার হাত ছড়িয়ে রাখতে বলেছি মানুষকে এটা জানাতে যে, শূন্য হাতে দুনিয়ায় এসেছি আবার শূন্য হাতেই দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি।

শিক্ষা : পৃথিবীর সবচেয়ে চরম সত্য কথা হচ্ছে–মৃত্যু। মুসলিম-অমুসলিম, বাদশাহ-ফকির কেউ তা অস্বীকার করে না। এই একটিমাত্র ব্যাপারেই পৃথিবীর সবাই একমত।

বীরবলের বেহেশত যাত্রা

বাদশাহ আকবর মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বাদশাহ ছিলেন। তিনি সবার সুখ-শান্তির কথা মাথায় রেখে তাদের ভালো রাখার চেষ্টা করতেন। বীরবল নামে তাঁর একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান ও আকবরের বিশ্বস্ত পাত্র। বীরবলের বুদ্ধির কথা সবাই জানতো তাই আকবরও তাকে একটু বেশিই ভালো বাসতেন। আর সেই কারণেই অনেক মন্ত্রী-শাস্ত্রী তাকে হিংসা করতো আর তাকে বাদশাহ থেকে আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করতো। একবার এক মন্ত্রী বীরবলকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আকবরের নাপিতের সঙ্গে ফন্দি আঁটলো। বাদশাহ একজন নাপিতের কাছেই সব সময় ক্ষৌরকর্ম করতেন। সেই নাপিত বীরবলকে একেবারে সহ্য করতে পারতো না তাই মন্ত্রীর ফন্দির সঙ্গে সেও গিয়ে মিলিত হলো।
নাপিত একদিন বাদশাহর চুল কাটতে কাটতে বললো, গতকাল আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ, আপনি হুকুম করলে বলতাম।
বাদশাহ বললেন, কী স্বপ্ন?
নাপিত বললো, কাল দেখলাম আপনার পূর্বপুরুষেরা আমাকে বললো, তাদের সেখানে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, বাদশাহর একজন বিশ্বস্ত ও দক্ষ মন্ত্রীকে যেন সেখানে পাঠানো হয়। একমাস সেখানে থেকে তাদের সমস্যা সমাধান করে আবার ফিরে আসতে পারবে।
বাদশাহ বললেন, তাদের কী অসুবিধা সেখানে?
নাপিত বললো– না, সেটা আমাকে জানায়নি, কেবল বলেছেন যেন বাদশাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও পারদর্শী মন্ত্রীকেই সেখানে পাঠানো হয়, আর আমি যেন সেটা বাদশাহকে জানিয়ে দিই।
বাদশাহ বললেন, সে তো বুঝলাম, কিন্তু সেখানে যেতে হলে তো তাকে মরতে হবে, আমার কোনো মন্ত্রী মরতে চাইবে! আমিও তাদের মরতে বলতে পারি না। আমি দেশের বাদশাহ, সবাইকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।
নাপিত বললো, আপনি আপনার মন্ত্রীদের বলে দেখতে পারেন, আর আমি একজন সন্ন্যাসীকে চিনি, যিনি মানুষকে জীবন্ত বেহেশতে পাঠাতে পারেন, আবার তাকে ফেরতও আনতে পারেন।

বাদশাহ বললেন, তাহলে তো খুবই ভালো, কালকেই তাকে দরবারে ডেকে আনো।
পরের দিন দরবারে সেই সন্ন্যাসীকে আনা হলো। সে বললো, সে মানুষকে বেহেশতে পাঠাতে পারে আবার ফেরতও আনতে পারে। কথা হলো লোকটি যদি আসতে চায় তবেই তাকে ফেরত আনা সম্ভব। কারণ অনেকেই বেহেশতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ছেড়ে ফেরত আসতে চায় না।

বাদশাহ আবার মুশকিলে পড়লেন, যাকে পাঠাবেন সে ফেরত না এলে তিনি বুঝতে পারবেন না তাদের পুর্বপুরুষের কষ্ট দূর হলো কি না।
সেই দুষ্টু মন্ত্রী রাজার কাছে নিবেদন করলো, বীরবলকে পাঠানোর জন্য। বীরবল খুবই বুদ্ধিমান, সে যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে পারবে, আর সে আপনার খুবই বিশ্বস্ত তাই ফেরতও আসবে।
তখন সবাই এই প্রস্তাবে মত দিয়ে দিল। বাদশাহ বীরবলকে বললেন, তুমিই আমার শেষ ভরসা, তুমি ছাড়া আমার উপায় নেই, তবে তুমি না চাইলে জোর করবো না।
বীরবল বললেন, আমি আপনার নুন খেয়েছি, আপনার জন্য আমি জীবনও দিতে পারি। আমি আপনার পূর্বপুরুষের সব সমস্যা দূর করে ফেরত আসবো। তবে সন্ন্যাসী বাবার আপত্তি না থাকলে আমি জানতে চাই, আমাকে কিভাবে বেহেশতে পাঠাবেন আর কোথায় এই সমস্যার সমাধান হবে।
সন্ন্যাসী আনন্দিত হয়ে বললো, এই কাজ যেখানে খুশি সম্পন্ন করা যেতে পারে, তবে আমরা নদীর তীরে এই কাজ সম্পন্ন করবো। সেখানে তোমাকে কবর দিয়ে এর উপর আমি যজ্ঞ করবো, এতেই তুমি স্বশরীরে বেহেশতে পৌঁছে যাবে।
বীরবল বললেন, ঠিক আছে মহামান্য বাদশাহ, আমি যাত্রা করবো, তার আগে আমাকে সপ্তাহখানেক সময় দিন, কতদিন পর ফেরত আসবো জানা নেই, কয়েকটা জরুরি কাজ বাকি আছে সেগুলো সেরে যেতে চাই।
সবাই এতে রাজি হয়ে গেল। এক সপ্তাহ পরে বীরবলকে কবর দেওয়া হয়ে গেল। বীরবলকে সরাতে পেরে ধূর্ত মন্ত্রী, নাপিত আর সন্ন্যাসীর মনে খুবই আনন্দ।

বাদশাহর মনের দুঃখ দিন দিন বাড়তে লাগলো, তার প্রিয় মন্ত্রী ফিরে আসছে না। তিনি ধরে নিয়েছেন বীরবল আর ফিরে আসবে না। তিনি মনে মনে বলছেন, তাকে পাঠানোটা ভুলই হয়েছে।

কিন্তু দু'মাস পর হঠৎ বীরবল ফিরে এলেন। তার মাথায় লম্বা চুল, মুখে লম্বা দাড়ি-গোফ, হাত-পায়ে লম্বা নখ। তাকে দেখে বাদশাহ আকবর ভীষণ খুশি হলেন বটে কিন্তু এর সঙ্গে ভাবলেন, বীরবলের এই অবস্থা কেন?

সেই কথা বীরবলের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানালেন, মহামান্য বাদশাহর পূর্বপুরুষেরা ভালোই আছে, কেবল সেখানে কোনো নাপিত নেই। তাই সেখানে কেউ চুল-দাড়ি কাটতে পারে না। আপনার দাদুর তো পা পর্যন্ত দাড়ি হয়ে গেছে, তার বাবার কথা তো বলারই নয়, খুবই করুণ অবস্থা। তাই মহামান্য বাদশাহ যেন খুব দ্রুত তার নাপিতকে সেখানে পাঠিয়ে দেন, এই কথা জানানোর জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

বীরবলের কথা শুনে বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে নাপিতকে কবর দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

নাপিত মরার ভয়ে বাদশাহর পায়ে পড়ে সব কথা খুলে বললো। কিভাবে সে, মন্ত্রী আর সন্ন্যাসী মিলে বীরবলকে তাদের পথ থেকে সরানোর জন্য ফন্দি এঁটেছিল।

এমন কথা শুনে বাদশাহ আকবর রেগে আগুন হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনকে কারাগারে বন্দী করার আদেশ দিলেন। এরপর বীরবলের কাছে জানতে চাইলেন, কিভাবে তুমি কবর থেকে বেঁচে ফিরলে? আমার সামনেই তো তোমাকে কবর দেওয়া হয়েছিল!

বীবরল বললেন, মহামান্য বাদশাহ! আমি এদের ফন্দি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাই এদের বেহেশতে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা আগেই জেনে নিয়েছিলাম। যখন জানতে পারলাম আমাকে নদীর পাড়ে কবর দেওয়া হবে, তখন সেখান থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে রেখেছিলাম আগে থেকেই। সে জন্যই আগে দিনকয়েকের ছুটি চেয়ে নিয়েছিলাম। আমাকে কবরে ঢোকানো হলে সেই গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম, আর এই ক'দিন বাড়িতেই ছিলাম।

বাদশাহ বললেন, আর এত লম্বা চুল-দাড়ি কেন?

বীরবল বললেন, এটাতো তাদের জালে তাদেরকেই ফাঁসানোর জন্য। সত্য কথা তাদেরই মুখ দিয়ে বের করার জন্য বেশ ধরেছি।
শেষে বাদশাহ আকবর বীরবলকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন।

শিক্ষা : অন্যকে বিপদে ফেলতে চাইলে নিজেই সেই বিপদে পড়তে হয়।

বিপদে পড়লে

নৌ পথ। অনেক যাত্রী নিয়ে একটা জাহাজ ছাড়লো। জাহাজটা অবিরাম চলছিল। যাত্রীরা আনন্দে নাচ-গান করছিল। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর ভীষণ ঝড় উঠলো সমুদ্রে, জাহাজ এখনই বুঝি ডুবে যাবে। সেখানে ছিল বিভিন্ন ধর্মমতের যাত্রী। তারা সবাই নিজেদের মতো করে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতে লাগলো। এটা সেটা মানত করতে লাগলো। আর ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল।
ঝড়ের দাপট অবশ্য একটু পরেই কমে গেল। এক সময় একেবারেই থেমে গেল। যাত্রীরা সবকিছু ভুলে আবার নাচ-গান শুরু করে দিল। সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা এবং মানতের কথা বেমালুম ভুলে গেল। মনে হয় একটু আগে ঝড়-তুফান কিছুই হয়নি।
জাহাজের নাবিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের এসব কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে সহ্য করতে না পেরে তিনি বলে উঠলেন– ভাইসব, মুশকিল আসানের পর ওয়াদার কথা ভুলে আমরা আনন্দে মেতে উঠেছি, এ কথাও মনে রাখবেন, আগের চেয়েও বেশি দুর্যোগের মধ্যে আমরা আবার পড়তে পারি। সুতরাং সাধু সাবধান!

শিক্ষা : সুখে-দুখে সব সময় সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের স্মরণে রাখা উচিত।

চামড়ার দুর্গন্ধ

এক দেশে ছিল এক চামড়া ব্যবসায়ী। তার ছিল একটা চর্মশালা। এক প্রভাবশালী ধনী লোক সেই চর্মশালার কাছে এসে আলিশান বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু চামড়ার দুর্গন্ধ তাকে অস্থির করে তুললো। কিছুতেই তিনি চামড়ার দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারছিলেন না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি চামড়া ব্যবসায়ীকে ডেকে বললেন, তোমার চর্মশালাটা এখান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও।

চামড়া ব্যবসায়ী উত্তরে কেবলই বলতে লাগলো– হচ্ছে, হবে, দু'দিন সবুর করুন, নেব, আমার চর্মশালা সরিয়ে নেব!
কিছুদিন এমনি চলার পর তাদের এ নিয়ে আর কোনো কথাবার্তা বলতে শোনা যায়নি। ধনী লোকটির এর মধ্যে চামড়ার গন্ধ সহ্য করা অভ্যাস হয়ে গেছে।

শিক্ষা : অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোনো সমস্যা হয় না।

একজন প্রজার সাহসিকতায়

এক দেশে এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিলেন। বিভিন্ন রকমের অত্যাচার তিনি করতেন। লোকজনের ঘোড়া-গাধা জোর করে কেড়ে নিতেন। বাদশাহ একদিন সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিকার করতে গেলেন। দলবল নিয়ে শিকার করতে আসা রাজাদের একটা আভিজাত্য এবং এটা একটা বড় উৎসব। রাজা একা একা একটা শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে করতে অনেকদূর চলে গেলেন। তাঁর অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই।
তখন সন্ধ্যা। রাজা টের পেলেন বনের উপর ঘন অন্ধকার নামছে। তার সঙ্গে কোনো অনুচর নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। তিনি কাছাকাছি এক গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এক ধনবান ব্যক্তির বাড়িতে রাত্রিযাপন

করবেন বলে সেখানে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু ঐ ধনবান লোকটি বাদশাহকে চিনতো না। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন, ধনী ব্যক্তিটি তার গাধাকে বেদম প্রহার করছে। গাধা কাতর হয়ে চিৎকার করছে। লোকটি নির্বিকার। সে গাধার একটা পা ভেঙে দিল। রাজা তাই দেখে লোকটিকে বললেন, কী হে, অবলা জীবটাকে এভাবে পেটাচ্ছ কেন? গাধার ঠ্যাং ভেঙে তুমি নিজের শক্তি পরীক্ষা করছো?

লোকটি উত্তেজিতভাবে জবাব দিল, আমার কাজ ভালো কি মন্দ, আমিই সেটা খুব ভালোভাবে জানি। গায়ে পড়ে তোমার কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

জবাব শুনে বাদশাহ খুব দুঃখ পেলেন। তিনি লোকটাকে বললেন, এইভাবে এই নিরীহ প্রাণীটাকে মারার কী কারণ থাকতে পারে দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে বলবে কি? আমার মনে হচ্ছে, তুমি যে শুধু নির্বোধ তাই নয় বরং আস্ত একটা পাগল।

লোকটি এ কথায় হেসে বললো– হ্যাঁ, আমি পাগলই বটে। তবে সব শুনলে তুমিও বুঝবে, আমি নির্বোধের মতো গাধাটার পা ভেঙে দিইনি। এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। আমাদের বাদশাহ খুব অত্যাচারী। একথা সবাই জানে। আমার সুস্থ সবল গাধাটির খবর পেলে নিশ্চয়ই তিনি জোর করে এটা নিয়ে যাবেন। শুনেছি, আমাদের এই এলাকায় বাদশাহ এসেছেন। তাই গাধাটাকে বাদশাহর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে খোঁড়া করে দিলাম। বাদশাহ গাধাটিকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে খোঁড়া অবস্থায় এটা আমার কাছে থাকা অনেক ভালো। আমাদের অত্যাচারী বাদশাহকে জানাই শত ধিক!

বাদশাহ গ্রামবাসী লোকটির মুখে নিন্দা শুনে কোনো জবাব দিলেন না। রাগে, অপমানে, দুঃখে সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। ঘুমহীন রাত কাটলো। ভোরের আলো ফুটল পুব আকাশে। মৃদু বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাখির কলকাকলিতে মুখর চারদিক। সৈন্যসামন্ত বাদশাহকে খুঁজতে খুঁজতে সাতসকালে হাজির হলো সেই গ্রামে। ধনী লোকের বাড়ির সামনে এলো তারা। মুহূর্তে শত শত লোকের ভিড় পড়ে গেল। সুসজ্জিত ভৃত্যেরা বাদশাহর সেবায় নিয়োজিত হলো। সেই বাড়ির সামনে জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল দরবার বসে গেল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি

রাজার সামনে এসে আসন গ্রহণ করলেন। রাজকীয় খানাপিনার আয়োজন করা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই এলাকার পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। সৈন্যদল ও ঘোড়ার পদভারে থরথর করে কাঁপতে লাগলো সেই এলাকা। বাড়ির সেই লোকটি ব্যাপার-স্যাপার দেখে একেবারে থ। গতরাতে স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন তার অতিথি। অর্থাৎ বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। বাদশাহ ডেকে পাঠালেন লোকটিকে। ধরে বেঁধে তাকে আনা হলো বাদশাহর সামনে।

লোকটি বুঝলো, তার আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই। এই মুহূর্তেই তার জীবন শেষ হবে। আর ভয় করে লাভ নেই। কারণ নাঙা তরবারির নিচেই মানুষের ভাষা অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। তাই লোকটি সাহস করে বললো, হে মহামান্য বাদশাহ, আমি একাই শুধু আপনার নিন্দা করি নাই। খবর নিয়ে দেখুন, জনসাধারণ সবাই একই কথা বলে থাকে। আমাকে সহজেই হত্যা করা আপনার পক্ষে সম্ভব। আমার কথায় আপনি মনে আঘাত পেয়েছেন, সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনার উচিত হবে ভালো কাজ করা, যেন কেউ আপনার বদনাম করতে না পারে। অন্যায় করে কখনো সুনাম অর্জন করা সম্ভব নয়। আপনার কর্মচারীরা সারাক্ষণ আপনার গুণকীর্তন করে থাকে। এতে রাজার সম্মান বাড়ে না। প্রজারা যদি বাদশাহর সুনাম করে, তাতেই বাদশাহর সম্মান বাড়ে।

বাদশাহ এই সাহসী সত্যকথা শুনে দারুন উদ্দীপ্ত হলেন। লোকটিকে মুক্ত করে দিলেন। সবার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি আজ থেকে চেষ্টা করবো ন্যায়পরায়ণ, সুশাসক হতে। আমি চাই একজন ভালো বাদশাহ হতে।
এরপর থেকে তিনি আর জুলুম-অত্যাচার করেননি।

শিক্ষা : এমন সাহসী প্রজা সব কালেই প্রয়োজন পড়ে।

পথিক ও বটগাছ

গ্রীষ্মকাল। দারুণ গরম পড়েছে। চারদিকের জলাশয়গুলো শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। মাটিও ফেটে চৌচির। এই ঠা-ঠা রোদে কয়েকজন পথিক চলতে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তাদের পা যেন আর চলতে চাইছিল না। এমন সময় পথের ধারে একটা বটগাছ দেখতে পেয়ে পথিকেরা গাছের শীতল ছায়ায় গিয়ে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর তাদের শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল, ক্লান্তিও দূর হলো।
এরপর তারা নিজেদের মধ্যে নানারকম আলোচনা আর গল্প করতে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন গাছটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে উঠলো, কী গাছরে বাবা, না আছে এতে কোনো ভালো ফুল, না আছে ভালো ফল। আর যে ফলগুলো আছে সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, এত বড় গাছ, তার নাকি এমন ক্ষুদে ক্ষুদে ফল! মানুষের কোনো কাজে আসে এ গাছ!

বটগাছটি পথিকের কথা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। সে বলে উঠলো, মানুষের মতো এমন অকৃতজ্ঞ জীব আর দুনিয়াতে নেই। রোদে পুড়ে এসে আমার ছায়ায় বসে তোমরা গা জুড়ালে, ঠাণ্ডা হলে। আরেকটু আরাম করার জন্য এখনো বসে রয়েছো, আর অকৃতজ্ঞের মতো বলে চলছো– আমি তোমাদের কাজে লাগি না। কেমন নিমকহারাম জাত তোমরা...!
বটগাছের কথা এখনো শেষ হয়নি। এমন সময় টুপ করে একটা বটের ফল নিন্দা করা লোকটার মাথায় এসে পড়লো। এতে সে হালকা ব্যথাও পেল। বটগাছটা তখন তাকে বলে উঠলো, আমার ফল ক্ষুদে ক্ষুদে বলে একটু আগে নাক সিঁটকাচ্ছিলে, যেটা পড়লো সেটা যদি নারিকেল বা কাঁঠালের মতো হতো, তাহলে কি তুমি এতক্ষণ আস্ত থাকতে পারতে?

শিক্ষা : আল্লাহ তাআলা ভারসাম্য রেখেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে কখনো ভুল ধরতে নেই।

মুচি যখন ডাক্তার

এক ছিল মুচি। কিন্তু সে ঠিকমতো জুতাও সেলাই করতে জানতো না। তাই তার নিজের গ্রামে খাবার জুটছিল না। সে তখন নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্য দেশে চলে এলো। সেখানে এসে নিজেকে সে ডাক্তার পরিচয় দিল এবং ঔষধের মতো দেখতে কতগুলো বড়িকে বিষের ঔষধ বলে প্রচার করতে লাগলো। তার চাপাবাজির ধোঁকায় পড়ে অনেকেই তা কিনতে লাগলো। ধীরে ধীরে তার ঔষধের ব্যবসা জমে উঠলো। বেশ পয়সা হয়ে গেল তার। খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

একবার সেই দেশের রাজার এক প্রিয় চাকরের খুব অসুখ হলো। রাজা বেশধারী ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। যথাসময়ে ডাক্তার রাজদরবারে হাজির হলো। রাজা ছিলেন খুব বিচক্ষণ। তাই চাকরের চিকিৎসার ভার দেওয়ার আগে লোকটিকে তিনি একবার যাচাই করে নিতে চাইলেন। রাজা এক গ্লাস পানি রেখে তাতে যেন কিছু বিষ মিশিয়ে দিচ্ছেন– এমন ভান করে বললেন, এখন কী ঔষধ আছে তোমার তা এতে দিয়ে এই পানিটা খেয়ে ফেলো দেখি, অনেক বখশিশ দেব তোমাকে।

তখন ডাক্তারের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কোনো উপায় না দেখে সে নিজের দোষ স্বীকার করে বললো, ঔষধ টষুধ তার কিছুই জানা নেই। তার কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে এখানকার লোকেরা তাকে একজন দক্ষ চিকিৎসক বলে মনে করেছে। এমনকি সে তখন তার এখানে আসার কারণও স্বীকার করলো।

রাজা তখন প্রজাদের ডেকে তার আসল পরিচয় সবার সামনে ফাঁস করে দিয়ে বললেন, অপদার্থ যে মুচির হাতে তার গাঁয়ের লোক তাদের জুতা মেরামত করতে দিতে সাহস পায় না– তোমরা এমন মূর্খ যে, না জেনেশুনে তার হাতেই তোমাদের জীবন রক্ষার ভার সঁপে দিয়েছিলে? সময়মতো ধরতে না পারলে না জানি কত বড় সর্বনাশ হয়ে যেত!

শিক্ষা : যাচাই বাছাই না করে কারো কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

পুকুরের পানির হিসাব

একজন বাদশাহ তার পুকুর পাড়ের প্রাইভেট বেঞ্চিতে বসা। তখন এক মাদরাসার ছাত্র কিতাব হাতে মাদরাসায় যাচ্ছিল। তা দেখে বাদশাহ মনে মনে বললেন– শুনেছি, মাদরাসার ছাত্ররা খুব তাহকিক ও বিশ্লেষণ করে পড়াশোনা করে, তা একটু পরখ করে দেখা দরকার। এ কথা মনে করে তিনি ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন। এর আগে মন্ত্রী মুখে উত্তর জানার ইচ্ছায় মন্ত্রীকে প্রশ্ন করে নিলেন– বলুনতো, এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?
মন্ত্রী বললেন, মহামান্য বাদশাহ, আগে তার পাশে এমন আরেকটি পুকুর খনন করে নিতে হবে, তারপর গ্লাস দিয়ে পানি ঢেলে পুকুরের পানি শেষ হওয়া পর্যন্ত দেখতে হবে কত গ্লাস পানি হয়!

মন্ত্রীর উত্তরে বাদশাহ সন্তুষ্ট হলেন কিনা তা এখনই প্রকাশ করলেন না। এরপর বাদশাহ মাদরাসার ছাত্রটিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি বলো দেখি, এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?
ছাত্রটি বললো, প্রথমে দেখতে হবে, গ্লাসটি কত বড়! গ্লাসটি যদি পুকুরের সমান হয়, তাহলে এই পুকুরে এক গ্লাস পানি আছে। গ্লাসটি যদি পুকুরের অর্ধেক হয়, তাহলে পুকুরে দুই গ্লাস পানি আছে। গ্লাসটি যদি পুকুরের চার ভাগের এক ভাগ হয়, তাহলে চার গ্লাস পানি আছে...।

তখন বাদশাহ ছাত্রটিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক বাবা আর বলতে হবে না। এরপর মন্ত্রীকে বললেন– দেখুন, আপনার জবাবে পানির পরিমাণ জানতে কেমন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এই মাদরাসার ছাত্রের জবাব সব জটিলতা পানি করে দিয়েছে। আর কত সহজেই সে উত্তরটি দিয়ে দিল। একেই বলে ইলমে তাহকিক বা বিশ্লেষণ জ্ঞান।

শিক্ষা : হেকমত, প্রজ্ঞা ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়। তাই বুদ্ধির পাশাপাশি হেকমতও প্রয়োজন।

হায়াতের বাগান

এক বাদশাহর একটি বাগান ছিল। বাগানটি ছিল অনেক বড়। বাদশাহ একজন লোককে ডাকলেন। তার হাতে একটি ঝুড়ি দিয়ে বললেন, এই বাগানে যাও এবং ঝুড়ি ভরে নানা রকম ফল-ফলাদি নিয়ে এসো। তুমি যদি ঝুড়ি ভরে ফল আনতে পার, আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। কিন্তু শর্ত হলো, বাগানের যে অংশ তুমি একবার পেরিয়ে যাবে সেখানে দ্বিতীয়বার যেতে পারবে না।

লোকটি ভাবলো, এটা তো কোনো কঠিন কাজ নয়। সে এক দরজা দিয়ে বাগানে ঢুকল। দেখলো, গাছে গাছে ফল পেকে আছে। নানা জাতের সুন্দর মনোলোভা ফল। কিন্তু এগুলো তার পছন্দ হলো না। সে বাগানের সামনের অংশে গেল। এখানকার ফলগুলো তার কিছুটা পছন্দ হলো। কিন্তু সে ভাবলো, আচ্ছা থাক আরো সামনে গিয়ে দেখি সেখানে হয়তো আরো উন্নত ফল পাব, সেখান থেকেই ফল নিয়ে ঝুড়ি ভরবো।

সে সামনে এসে অনেক উন্নতমানের ফল পেল। এখানে এসে তার মনে হলো, এখান থেকে কিছু ফল ছিঁড়ে নিই। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলো, সবচেয়ে ভালো ফলই ঝুড়িতে নিব। তাই সে সামনে এগিয়ে বাগানের সর্বশেষ অংশে ঢুকলো। কিন্তু এখানে এসে দেখলো ফলের কোনো চিহ্নই নেই। সে এখন আফসোস করে বলতে লাগলো, হায় আমি যদি বাগানে ঢুকেই ফল সংগ্রহ করতাম, তাহলে আমার ঝুড়ি এখন খালি থাকতো না। আমি এখন বাদশাহকে কিভাবে মুখ দেখাবো...।

শিক্ষা : শূন্য ঝুড়ি নিয়ে বাগানে প্রবেশকারী লোকটির সঙ্গে দুনিয়ার বাগানে প্রবেশকারী আমাদেরকে তুলনা করা যায়। আমাদেরকে নেক কাজের ফল ছিঁড়তে বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা প্রতিদিনই ভাবি, আগামীকাল থেকে ফল ছেঁড়া শুরু করবো। আগামীকাল আগামীকাল করতে করতে আমাদের জীবনে আর আগামীকাল আসবে না। এভাবেই শূন্য হাতে আমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তাই হায়াত নামক বাগানে বিচরণকালে নেকি নামক ফল দিয়ে প্রথম থেকেই আমলনামার ঝুড়ি পূর্ণ করা উচিত।

স্বপ্ন হলো সত্যি

এক নিরীহ বৃদ্ধের একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল তরুণ আর অসীম সাহসী, শিকারে নিপুণ এবং খুবই উৎসাহী।

বৃদ্ধ একদিন স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর একমাত্র ছেলেটিকে সিংহ মেরে ফেলেছে। এই স্বপ্ন দেখে বৃদ্ধটি খুব ভয় পেয়ে গেলেন, কি জানি কি হয়! স্বপ্নে দেখা ব্যাপার অনেক সময় বাস্তবেও ঘটতে দেখা যায়। তাই সাবধান থাকা ভালো মনে করে তিনি মাটির নিচে উঁচু পাঁচিল দেওয়া একটা বড় রকমের ঘর তৈরি করিয়ে ছেলেটিকে সেখানে আটকে রেখে বাইরে প্রহরী নিয়োগ করে দিলেন।

ছেলের আবার খুব শিকারের শখ ছিল। জীব-জন্তু দেখলে তার মন ভালো থাকবে মনে করে তিনি ঐ ঘরের দেয়ালে শিল্পী দিয়ে নানান জীব-জন্তুর ছবি আঁকলেন, সিংহের ছবিও বাদ পড়লো না। এসব ছবি দেখে শিকারী ছেলের মনটা ছটফট করতো। কবে ছাড়া পাবে সে কে জানে? বিশেষ করে সিংহের প্রতি চোখ পড়লেই তার মেজাজটা খারাপ হয়ে যেত। সেটাকে লক্ষ্য করে ছেলেটি বলতো, মর তুই মর, তুই আর বাবার দেখা মিথ্যে স্বপ্ন– এই দুই কারণে আমি এখানে গৃহবন্দী। কী করে যে তোকে খতম করবো...!

এসব ভাবতে ভাবতে সিংহের ওপর রাগ আর সামলাতে পারলো না। সে 'দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা' বলে দেয়ালে আঁকা সিংহের চোখ উপড়ে ফেলার জন্য চোখের ওপর সজোরে তার নখ ফোটাতে গেল। অমনি দেয়ালের পলেস্তরা ঢুকলো ছেলেটার নখের ভেতর। দারুণ যন্ত্রণা হতে লাগলো। এই যন্ত্রণায় সারা শরীর যেন বিকল হয়ে গেল। শেষে এই অসহ্য যন্ত্রণার কারণে হলো জ্বর। ভীষণ জ্বর। সেই জ্বরে ছেলেটা মারাই গেল। সিংহের হাতে ছেলের মৃত্যু হবে–স্বপ্ন দেখেছিলেন বাবা। তাই-ই হলো, ছবি হলেও সিংহ তো বটে!

শিক্ষা : যার যেভাবে মৃত্যু লেখা রয়েছে, তার মৃত্যু সেভাবে হবেই।

রাঁধুনির কাছে রাজার পরাজয়

এক দেশে ছিলেন এক বীর রাজা। রাজার ছিল অনেক শক্তি। কেউ তাকে যুদ্ধে হারাতে পারতো না। তার চারপাশের দেশের রাজারা পড়লেন মহাচিন্তায়। কোনদিন না সে আবার তাদের দেশ দখল করে নিয়ে নেয়। তাই ঐ রাজারা অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন। তারা ডেরা পিটিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করার ব্যবস্থা করলেন, যে এই বীর রাজাকে যুদ্ধে হারাতে পারবে তাকে দেওয়া হবে অর্ধেক রাজত্ব। আর রাজকন্যা যদি রাজি হয় তবে রাজকন্যার সঙ্গে বীরযোদ্ধাকে বিয়ে দেওয়া হবে।
কিন্তু কেউই সাহস করলো না বীর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কারণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেই নিশ্চিত মরতে হবে। সেই রাজারা হতাশ, বীর রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না।
কিছুদিন পর এক রাঁধুনি এলো রাজার দরবারে। বললো, আমি বীর রাজাকে হারাবো।

তার কথা শুনে রাজারা তো অবাক! যেখানে বীর সেনাপতিরা ভয় পায় সেখানে এক রাঁধুনি কিনা হারাবে বীর রাজাকে! এটা কিভাবে সম্ভব?
রাঁধুনি বললো, আমাকে বিশ্বাস করুন মহারাজ, আমিই পারবো বীর রাজাকে হারাতে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।
রাজারা বললেন, ঠিক আছে, তুমি যখন এতো করে বলছো, তখন তোমাকে একবার সুযোগ দেওয়া হলো, চেষ্টা করে দেখো হারাতে পার কি না।
রাজার অনুমতি পেয়ে রাঁধুনি বীর রাজার দেশে গেল। সেখানে রাজার দরবারে গিয়ে বললো– হুজুর, আমাকে আপনার রান্নার দায়িত্ব দিতে পারেন, আমি অনেক মজার মজার রান্না জানি। আপনি এমন মজার রান্না আপনার জীবনেও খাননি।
রাঁধুনির কথা শুনে বীর রাজার জিভে পানি চলে এলো। তিনি বললেন, ঠিক আছে, এখনি তুমি কাজে লেগে যাও।
রাঁধুনি রাজার জন্য দিনরাত মজার মজার সব খাবার বানাতে শুরু করলো। খাঁটি ঘিয়ের পোলাও, গরুর কাচ্চি বিরিয়ানী, খাসির রেজালা, হরেক রকম

মিষ্টি, চকলেট কেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, রঙ-বেরঙের ড্রিঙ্কস, বীফ বার্গার সহ আরো কত কি!

রাজা শাক-সবজি খাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলেন। পানির বদলে সব মজার মজার ড্রিঙ্কস খেতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে রাজার ভুরি বেড়ে গেল, চর্বি বেড়ে গেল, কোলেস্টরল বেড়ে গেল, রাজার ডায়াবেটিস হলো। ডাক্তার বললো, মহারাজ! আপনি বেশি করে সবজি খান, আর এসব তেলচর্বির খাবার ছেড়ে দিন।

কিন্তু রাঁধুনি প্রতি বেলায়ই মজার মজার খাবার বানিয়েই চললো। খাঁটি ঘিয়ের পোলাও, গরুর কাচ্চি বিরিয়ানী, খাসির রেজালা, হরেক রকম মিষ্টি, চকলেট কেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বীফ বার্গার, রঙ-বেরঙের ড্রিঙ্কস, বীফ বার্গার আরো কত কি!

রাজা খাবার টেবিলে এসব খাবার দেখে বললেন, ডাক্তার আমাকে এসব খেতে নিষেধ করেছে।

রাঁধুনি বললো, মহারাজ! আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি, তাই কষ্ট করে এসব মজার খাবার আপনার জন্যই রান্না করি। আপনি না খেলে তো আমার সব কষ্টই বৃথা।

রাজা ভাবলেন, তাইতো! বেচারী এত কষ্ট করে আমার জন্য রান্না করে, আমাকে এতো ভালোবাসে, আমি এগুলো না খেলে সে মনে কষ্ট পাবে। তাই রাজা তাকে খুশি করতে এই খাবারগুলো নিয়মিতই খেয়ে যান।

কয়েক মাস পর রাজার বুকে অনেক ব্যথা হলো। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার বললো, মহারাজ আপনার হার্টে অসুখ হয়েছে, আপনি বেশি করে সবজি খান। আর এসব খাবার ছেড়ে দিন।

কিন্তু রাঁধুনি মজার খাবার বানিয়েই চললো। খাঁটি ঘিয়ের পোলাও, গরুর কাচ্চি বিরিয়ানী, খাসির রেজালা, হরেক রকম মিষ্টি, চকলেট কেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, রঙ-বেরঙের ড্রিঙ্কস,বীফ বার্গার আরো কত কি!

রাজা খাবার টেবিলে এসব খাবার দেখে বললেন, ডাক্তার আমাকে এসব খেতে মানা করেছে।

রাঁধুনি বললো, মহারাজ! আজ মেহমান এসেছে, মেহমানদের সঙ্গে একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না। রাজা ভাবলেন, তাইতো! একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না।

রাঁধুনি মজার খাবার বানিয়েই চললো। খাঁটি ঘিয়ের পোলাও, গরুর কাচ্চি বিরিয়ানী, খাসির রেজালা, হরেক রকম মিষ্টি, চকলেট কেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, রঙ-বেরঙের ড্রিঙ্কস, বীফ বার্গার আরো কত কি!

রাজা খাবার টেবিলে এসব খাবার দেখে বললেন, ডাক্তার আমাকে এসব খেতে মানা করেছে।

রাঁধুনি বললো, মহারাজ, আজ একটা খুশির দিন, আজ খেলে কিচ্ছু হবে না।

এভাবে যখনই রাজা বলতো, ডাক্তার আমাকে এসব খেতে মানা করেছে, রাঁধুনি কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে বলতো, মাত্র একদিন খেলে কিচ্ছু হবে না। এভাবে রাঁধুনি মজার খাবার বানিয়েই চললো। খাঁটি ঘিয়ের পোলাও, গরুর কাচ্চি বিরিয়ানী, খাসির রেজালা, হরেক রকম মিষ্টি, চকলেট কেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, রঙ-বেরঙের ড্রিঙ্কস, বীফ বার্গার আরো কত কি! আর রাজা খেয়েই চললেন।

কিছুদিন পর রাজার আবার প্রচণ্ড বুকে ব্যথা শুরু হলো। ডাক্তার এলো, ডাক্তার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হলো না। অবশেষে রাজা মারা গেলেন।

রাজা মারা যাওয়ার পর রাঁধুনি দৌড়ে গেল পাশের দেশের রাজার দরবারে তার পুরস্কার আনতে।

শিক্ষা : শক্তি দিয়ে সবকিছু জয় করা যায় না, সঙ্গে বুদ্ধি ও কৌশল লাগে। আর খাবারের ব্যাপারে সবার সচেতন হওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিত্যাগ করা উচিত। তবে এমন কূটকৌশল করে মানুষ মেরে ফেলা মারাত্মক অপরাধ।

দুখের ভাগ

দুইজন লোক একসঙ্গে পথ ধরে চলছিল। ওদের একজন পথে একখানা কুড়াল কুড়িয়ে পেতেই অপরজন বলে উঠলো, আমাদের আজ যাত্রা শুভ, আমরা একটা ভালো জিনিস কুড়িয়ে পেলাম।
এই কথা শুনেই তার সঙ্গী বলে উঠলো, 'আমরা আমাদের' বলছো কেন, বলো তোমার যাত্রা ভালো, তুমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেলে।

এরপর আবার তারা পথ চলতে লাগলো। কিছুদূর এগোতেই দেখলো, যাদের কুড়াল হারিয়েছিল তারা ছুটে আসছে। দেখেই যে কুড়াল পেয়েছিল সে বলে উঠলো–এই রে, এবার আমরা গেছি।
সঙ্গীটি অমনি বলে উঠলো, এবার 'আমরা' বলছো কেন? বলো, এবার আমি গেছি। মনে নেই কুড়াল পাওয়ার সময় যখন 'আমরা' বলেছিলাম, তখন তুমি কেমন ফোঁস করে উঠেছিলে?

শিক্ষা : সুখে-দুখে সব সময় সঙ্গীদের সাথে রাখা উচিত।

ভণ্ডপীরের কেরামতি

এক ভণ্ডপীর নিজের পীরত্ব প্রচারের জন্য এক কৃত্রিম কেরামতির অবতারণা করলেন। তিনি সেজে গুজে এক নতুন রাজ্যে প্রবেশ করলেন। তার এক খাস খাদেমকে কাফনের কাপড় পরিয়ে লাশবাহী খাটে শোয়ালেন। মরা-কান্না কাঁদার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত করলেন। এরপর জানাযা পড়ার জন্য লোকজন ডাকা হলো। জনতার বিশাল জমায়েত যখন জানাযা পড়ার অপেক্ষা করছে তখন পীর সাহেব হঠাৎ করে খাটের কাছে আবির্ভূত হলেন এবং লাশকে লক্ষ্য করে বললেন, কুম বি-ইজনিল্লাহ–আল্লাহর ইচ্ছায় উঠে দাঁড়াও।

পীর সাহেবের কথা শোনামাত্রই লাশটি কাফনের কাপড় ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হাত তুলে জনতাকে সালাম জানালো।

সরলমনা জনগণ পীরের এই কেরামতি দেখে চারদিকে কথার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে ভিড় করতে লাগলো। রাজ্যের রাজাও এই নবাগত পীরের কাহিনী শুনতে পেলেন। তিনি ছিলেন খুব বুদ্ধিমান। পীরকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। পীর সাহেব ভাবলেন, তার কৌশলটি বৃথা যায়নি। রাজাও তার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি খুশিমনে রাজার দরবারে হাজির হলেন।

রাজা বললেন, যুদ্ধে আমার সেনা-বাহিনীর অনেক লোক মারা যায়। ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে। কারণ তেমন ট্রেনিং প্রাপ্ত সৈন্য আর পাওয়া যায় না। আপনি আমার রাজ্যেই থাকুন। তাদেরকে জীবিত করাই আপনার কাজ। আপনার ভরণপোষণ এবং যাবতীয় খরচপাতি আমরা বহন করবো।

রাজার কথা শুনে পীর সাহেবের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। তিনি দুই চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন এবং সুযোগ বুঝে রাতারাতি সে দেশ ছেড়ে পালালেন।

শিক্ষা : প্রকৃত পীর কখনো ইচ্ছাকৃত কোনো 'কারামত' প্রকাশ করেন না। মুরিদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা বা দুনিয়ার কোনো সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না। তাঁদের মজলিসে বসলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগরিত হয়, পরকালের কথা মনে পড়ে যায় এবং অন্তর অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে।

চাষীর কুঁড়ে ছেলেরা

এক গ্রামে এক চাষী ছিলেন। তার ছেলেরা ছিল ভীষণ কুঁড়ে। মরার আগে চাষী ছেলেদের কাছে ডেকে বললেন– শোনো পুত্ররা, আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমাকে এবার যেতে হচ্ছে। এ পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে কয়েকটি কথা তোমাদের বলতে চাই। ভালো করে মন দিয়ে শোনো।

তোমাদের আমি যা দিয়ে যেতে চাই, তা ঐ যে আঙুরের ক্ষেত দেখছো– ঐ ক্ষেতের নিচে লুকানো আছে, খুঁড়ে দেখবে তোমরা। ভালো করে খুঁড়লেই পেয়ে যাবে।

কয়েক দিন পর চাষী মারা গেলেন। চাষীর মৃত্যুর পর তার ছেলেরা ভাবলো, বাবা যা বলে গেলেন এতে বোঝা যায় আঙুর ক্ষেতে তিনি কিছু গুপ্তধন রেখে গেছেন। এই ভেবে গুপ্তধনের খোঁজে তারা পুরো আঙুর ক্ষেতই খুঁড়ে ফেললো। খুব ভালো করেই খুঁড়ে দেখলো। কোনো জায়গাই বাদ রইলো না। কিন্তু কোথাও গুপ্তধন পাওয়া গেল না। সব ভুংভাং।

কিন্তু এমন ভালো করে খোঁড়ার ফলে ঐ ক্ষেতে সে বার প্রচুর আঙুর হলো, এমনটি আর কোনো বার হয়নি। এজন্যই হয়তো চাষী তার কুঁড়ে ছেলেদের এমন কথা বলে গিয়েছিলেন।

শিক্ষা : মানুষের স্বভাব মতোই তাদের কাজে লাগাতে হয়।

অবিশ্বাসী বন্ধু!

দুই বন্ধু মিলে দেশ ভ্রমণে বের হলো। এদের একজন ছিল অন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে তারা এমন এক জায়গায় এলো, যেখানে রাতে খুব ঠাণ্ডা আর দিনে খুব গরম। দুই বন্ধু একটা গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়লো। সকালে যে বন্ধু চোখে দেখতে পায়, সে খাবারের খোঁজে বের হলো। অন্ধ বন্ধুটি আশপাশে যা আছে তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলো।

একটি সাপ বরফে জমে অবশ হয়ে একপাশে মরার মতো শুয়ে ছিল। অন্ধ বন্ধুটি সাপটিকে ধরে ভাবলো এটি একটি লাঠি। সে খুব খুশি হয়ে সেটা হাতে নিল, ভাবলো পথ চলতে এটা তার অনেক কাজে লাগবে। মরার মতো সাপকে হাতে নিয়ে সে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করলো।

অন্য বন্ধু খাবার নিয়ে ফিরে এসে সাপ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। বন্ধুকে বললো, তাড়াতাড়ি এটা হাত থেকে ফেলে দাও, এটা বিষাক্ত।

অন্ধ বন্ধু কিছুতেই বিশ্বাস করলো না যে এটা লাঠি নয়–সাপ।
সে ভাবলো, তার কুড়িয়ে পাওয়া দামি লাঠি বন্ধুটি কৌশলে নিয়ে নিতে চাইছে। সে কিছুতেই বন্ধুর কথা শুনলো না। তাই উপায় না দেখে দৃষ্টিমান বন্ধু আবারো অন্ধ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা শুরু করলো। দিনের বেলায় রোদ উঠে তাপ বাড়তে লাগলো, সাপটি তার চেতনা ফিরে পেতে শুরু করলো। পরে এক সময় সে অন্ধ বন্ধুকে ছোবল মেরে বসলো। বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অন্ধ বন্ধুটি মারা গেল।

শিক্ষা : বন্ধুর কথা বিশ্বাস করতে হয়। অবিশ্বাসে বন্ধুত্ব হয় না।

কম সুখ বেশি সুখ

নাসিরুদ্দিন হোজ্জা নামে একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তারই একটি গল্প। এক ভদ্রলোকের তার বউয়ের সঙ্গে খুব ঝগড়াঝাটি হতো। বউটি ছিল ভীষণ ঝগড়াটে। কোনোদিন সে তার স্বামীকে সুখে থাকতে দিত না। কোনো উপায় না দেখে ভদ্রলোক একদিন কিছু টাকা-পয়সা ও জামা-কাপড় নিয়ে কোথাও চলে যাওয়ার মনস্থ করলো। এরপর যাওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।
নাসিরুদ্দিন সেই লোকটিকে মুখ ভার করে রাস্তার পাশে বসে থাকতে দেখে জানতে চাইলেন, তোমার কী হয়েছে? কেন তুমি এমনভাবে রাস্তার পাশে বসে আছো?
লোকটি বললো, আমার স্ত্রীর জন্য জীবন একেবারে বিষের মতো হয়ে গেছে হোজ্জা সাহেব! হাতে কিছু পয়সা আছে বটে কিন্তু মনে সুখ নেই। তাই দেশে দেশে ঘুরতে বেরিয়েছি। যেখানে কোনো সুখের সন্ধান পাব, সেখানেই থেকে যাব।
লোকটির পাশে তার পোঁটলায় টাকাকড়ি জিনিসপত্র সব রাখা ছিল। তার কথা শেষ হতে না হতেই নাসিরুদ্দিন সেই বোঁচকাটা নিয়ে দৌড়ে পালাতে লাগলেন। হোজ্জাকে পোঁটলাটা নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে লোকটিও তার

পেছনে প্রাণপণ দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু হোজ্জা খুব দৌড়াতে পারতেন আবার বুদ্ধিও আছে– এমন অবস্থায় তাকে ধরে কার সাধ্য! দেখতে দেখতে তিনি রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া হয়ে গেলেন। এরপর তিনি আবার সেই রাস্তায় ফিরে পোঁটলাটা রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

এদিকে লোকটিও কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও বেশি দুঃখিত দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার পোঁটলাটি পড়ে আছে দেখে মহাআনন্দে চিৎকার করে পোঁটলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এতক্ষণে সে যেন প্রাণ ফিরে পেল।

গাছের আড়াল থেকে নাসিরুদ্দিন বেরিয়ে এসে বললেন, দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেওয়ার এটাও একটা উপায় দেখতে পেলাম, কী বলো ভাইয়া।

এই বলে নাসিরুদ্দিন হোজ্জা লোকটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চলে গেলেন।

শিক্ষা : দুখের যেমন বিভিন্ন স্তর আছে, সুখেরও তেমন স্তর আছে।

তেতো ফল মিষ্টি!

হযরত লোকমান একজন হাকিম এবং মহাজ্ঞানী ছিলেন। কারো কারো মতে তিনি নবীও ছিলেন। পবিত্র কুরআনেও তার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তিনি এক ব্যক্তির বাগানে চাকরি করতেন। বাগানের মালিক একদিন হযরত লোকমান হাকিমকে একটি কাকড়ি (শসা জাতীয় ফল) আনতে বললেন। পরে মালিক তা কেটে টুকরো করে এক টুকরো লোকমান হাকিমকে খেতে দিলেন। তিনি তা মুখে নিয়ে খুব মজা করে খেতে লাগলেন। তার খাওয়া দেখে মালিক ভাবলেন, নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে, নইলে এতো মজা করে খাবে কেন। তাই তিনিও এক টুকরো মুখে দিলেন। কিন্তু সেটা এতোটাই তেতো ছিল যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত

করে ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি বেশ মজা করে খাচ্ছো! কিন্তু এটা তো অনেক তেতো, যেন একেবারে বিষ মাখানো।
লোকমান হাকিম বললেন, ব্যাপারটা তাই, কিন্তু আমি না বলার কারণ হলো, ভাবলাম যে হাত দিয়ে শতবার মিষ্টি খেয়েছি সে হাত দিয়ে একবার মাত্র তেতো জিনিস খেয়ে যদি অভিযোগ করি, তাহলে সেটা মোটেও শোভনীয় হবে না।

শিক্ষা : হযরত লোকমান হাকিমের এ নীতি এমনই এক পরশ পাথর যে, স্বামী স্ত্রী যদি সব সময় এ নীতিকে স্মরণ রাখে, তবে তাদের মাঝে কখনো ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য হবে না। যেমন, স্ত্রী যদি মনে করে স্বামী আমার কত মান-অভিমান, জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে আসছে, একবার না হয় একটু কঠোর ব্যবহার করেছে, এতে কী আসে যায়? তেমনি স্বামীও যদি মনে করে, স্ত্রী আমার হাজারো সেবা করে থাকে, একবার না হয় একটু স্বভাব বিরোধী কথা বলে ফেলেছে। যাক এতে কী হবে? তাহলে কখনই ঝগড়া বিবাদ হবে না।

ছোট চোর বড় চোর

একদল ডাকাত ব্যাংকে ঢুকলো ডাকাতির জন্য। উপস্থিত গ্রাহক আর কর্মচারীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলো। ডাকাতরা সবাইকে বললো, টাকা গেলে সরকারের যাবে, আর প্রাণ গেলে যাবে আপনার। আপনারাই বুঝুন কোনটা বাঁচাবেন।
এই কথা শুনে সবাই বসে গেল। ডাকাতরা নির্বিঘ্নে টাকা নিয়ে চলে গেল। ডাকাতরা তাদের নিয়ে আসা বস্তা ভর্তি করে যতদূর সম্ভব টাকা নিয়ে তাদের আস্তানায় ফিরে গেল। একজন শিক্ষিত ডাকাত বললো, এবার আমরা কত টাকা লুট করলাম তা গুনে দেখা দরকার।
সবচেয়ে প্রবীণ ডাকাত বললো– ধুর, এত টাকা গুনতে তো অনেক কষ্ট হবে। একটু পরেই টিভিতে বলবে কত টাকা লুট হয়েছে। আমরা তখনই জেনে যাব।

ঘটনা শুনে ব্যাংকপ্রধান ব্যাংক পরিদর্শনে গেলেন। তিনি বললেন, ডাকাতরা শুধু কয়েক বস্তা টাকাইতো নিয়েছে। বেশির ভাগ টাকা তো রয়েই গেছে, আর সেফ ডিপোজিট বক্সগুলোও তো আছে। আসেন আমরা কয়জন সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিই। কেউ বুঝতেও পারবে না।

রাতে টিভিতে সংবাদ এলো, 'ব্যাংক থেকে ২০ কোটি টাকাসহ হাজার ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট'। ডাকাতরা হাজারবার গুনেও তাদের বস্তায় এক কোটি টাকার বেশি পেল না। আর স্বর্ণালঙ্কার তো তারা নিতেই পারেনি। তারা বুঝতে পারলো চোরের উপর বড় চোর আছে ।

শেষ পর্যন্ত ডাকাতদল ধরা পড়লো, রিমান্ডে গিয়ে স্বীকার করতে হলো তারাই সব টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার ডাকাতি করেছে। তাদের সবার যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গেল। আর ব্যাংকের লোকেরা রয়ে গেল ধরাছোঁয়ার বাইরে।

শিক্ষা : অনেক ক্ষেত্রে কাগুজে ডিগ্রির চেয়ে অভিজ্ঞতা বেশি কাজে লাগে। আর যে যত বড় তার চুরি তত বড়। ছোট চোরেরা শাস্তি ভোগ করে মরে আর বড় চোরেরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

উপস্থিত বুদ্ধি

এক দেশে ছিল এক বুদ্ধিমান প্রজা। উপস্থিত বুদ্ধিতে সারাদেশে তার জুড়ি ছিল না। সে সেই দেশের বাদশাহকে কিছু খাবার উপহার দেওয়ার কথা ভাবলো। ভাবনা অনুযায়ী সে একদিন একটি রাজহাঁস রান্না করে বাদশাহকে উপহার দিতে গেল। কিন্তু যেতে যেতে পথে তার ক্ষুধা পেয়ে বসলো। তাই সে পথের পাশে বসে রাজহাঁসের একটি পা খেয়ে ফেললো। প্রাসাদে এসে খুব সম্মানের সঙ্গে বাদশাহকে রাজহাঁস উপহার দিল। বাদশাহ রাজহাঁস উল্টেপাল্টে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রাজহাঁসের কি মাত্র একটি পা?

সে ভাবতেই পারেনি যে, বাদশাহ উপহার পাওয়া জিনিস এতো ভালো করে দেখবেন। কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইলো। হঠাৎ তার চোখ গেল বাইরে। সে দেখলো, প্রাসাদের চত্বরে একদল রাজহাঁস এক পা গুটিয়ে এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তার মাথায় বুদ্ধি এলো। সে রাজহাঁসগুলোর দিকে আঙ্গুল সোজা করে বললো– জাহাঁপনা, দুনিয়ার সব রাজহাঁসেরই একটি মাত্র পা থাকে। দুই পা বিশিষ্ট রাজহাঁস তো দেখা যায় না। আপনি ঐ চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা হাঁসগুলোকে একটু দেখুন!

বাদশাহ দেখলেন এবং প্রহরীকে রাজহাঁসগুলো তাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন। বেচারা রাজহাঁসগুলো প্রহরীর লাঠির আঘাত থেকে বাঁচার জন্য দু'পায়ে চলতে চলতে চলে গেল।
বাদশাহ হেসে বললেন– দেখলে, এইসব রাজহাঁসের মধ্যে কোনোটিরও একটি পা নয়, সব হাঁসেরই দুটো করে পা।
বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বুদ্ধিমান লোকটি বললো– জাহাঁপনা, রাজহাঁসের কথা বাদ দিন। এতো মোটা লাঠি নিয়ে কেউ যদি আপনাকেও তাড়া করে, তাহলে আপনিও দুই পা-কে চার পা বানিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াবেন।

শিক্ষা : সময়ে উপস্থিত বুদ্ধি গ্রন্থগত বিদ্যা থেকেও বেশি কাজে আসে।

দরীঁ চেহ্ শক

এক ফারসিভাষী তার পোষা টিয়াকে ফারসি ভাষা শেখানোর জন্য খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু পাখিটি 'দরীঁ চেহ্ শক'–'এতে সন্দেহ কী?' এই একটি বাক্য ছাড়া অন্য কিছু শিখতে পারলো না।
তখন মনিব রাগে-ক্ষোভে পাখিটি বিক্রি করে ফেলার কথা ভাবলেন। একদিন পাখিটি বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেলেন। বুদ্ধি করে পাখিটির মূল্য বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা দাবি করলেন। বাজারে

এসেছিলেন এক মোগল বংশের লোক। তিনি অনেক ধনী, খুব সৌখিনও বটে। মূল্য শুনে লোকটি উপহাস করে পাখিটিকেই জিজ্ঞেস করে বসলেন, তুমি কি এই মূল্যের উপযুক্ত?
পাখিটি চেঁচিয়ে বলে উঠলো, দরী চেহ্ শক–এতে সন্দেহ কী?
পাখিটির উত্তর শুনে সৌখিন লোকটি খুব পুলকিত হলেন এবং দুই হাজার টাকা দিয়েই একে কিনে বাড়ি চললেন।
মোগলীয় লোকটি বাড়িতে গিয়ে যত কথা আর প্রশ্নই পাখিটির সঙ্গে করলেন, পাখির উত্তর সেই একই– দরী চেহ্ শক।
শেষে লোকটি মন খারাপ করে নিজেকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, হায়! আমি এমন এক বোবা টিয়াপাখি এতো টাকা দিয়ে কিনে আনলাম। আমি কত বড় বোকা!
পাখিটি তখন মিষ্টি কণ্ঠে বলে উঠলো, দরী চেহ্ শক–এতে সন্দেহ কী?
পাখির মুখে একথা শুনে লোকটি হেসে ফেললেন এবং পাখিটিকে মুক্ত করে দিলেন।

শিক্ষা : জায়গা বুঝে মেধা ও শ্রম দিতে হয় এবং কিছু পাওয়ার আশা করতে হয়। অপাত্রে কষ্ট করে ফলের আশা করা বৃথা।

দিল কলাপড়া হলো কপালপোড়া

এক মহিলার সবকিছু পরিষ্কার করে রাখার অভ্যাস ছিল। দু'টি ছোট মেয়েকে তার এই কাজে নিয়োগ দিল। সে মেয়ে দু'টিকে খুব খাটাতো। ভোরবেলা মোরগের কুঁককুরু কুঁক ডাক শোনা গেলেই সে তাদের কাজ করার জন্য ঠেলে তুলে দিত। এভাবে প্রতিদিন ভোরে উঠতে গিয়ে মেয়ে দু'টি অনেক দুর্বল ও বিরক্ত হয়ে গেল। তাই ওরা একদিন ঠিক করলো, মোরগটাকে শেষ করে দিলেই আর তাদের মেডামকে জাগাতে পারবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। মেরে ফেললো তারা মোরগটাকে। কিন্তু এবার তারা আরো মুশকিলে পড়ে গেল। মোরগের ডাক না শুনতে পাওয়ায়

তাদের মেডাম এখন সময়ের সঠিক হিসাব রাখতে পারে না। তাই মাঝরাতেই সে তাদের তুলে দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে লাগলো। এবার মেয়ে দু'টি আরো বেশি সমস্যায় পড়ে গেল।

শিক্ষা : অসদুপায়ে কাজের চাপ কমাতে গেলে ঝামেলা আরো বেড়ে যায়। এভাবে অসহায়রা পিষ্ট হতে হতে একসময় কোনো একটা ভুল করে বসে, তখন তারা আরো বেশি পিষ্ট হয়।

অন্যায়ের প্রশ্রয়ে

একটি ছেলে ছোট বেলায় তার মাকে হারিয়েছিল। তাই সে তার খালার কাছে বড় হচ্ছিল। খালা তাকে খুব আদর করতেন। তার মা নেই বলে কখনো কেউ তাকে বকাঝকা করতো না।
একদিন ছেলেটি স্কুলের এক সহপাঠীর পেন্সিল চুরি করে এনে তার খালাকে দেখালো, খালা তাকে শাসন না করে তার প্রশংসাই করলেন। ছেলেটি আরেকবার তার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা দামি জামা চুরি করে এনে তারা খালাকে দিল। খালা তাকে আরো প্রশংসা করলেন।

এরপর ছেলেটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে যৌবনে উপনীত হলো। তখন সে আরো বড় ধরনের চুরি করতে শুরু করলো। এমনি করতে করতে একদিন সে ধরা পড়ে গেল। তার বিচার হলো আদালতে। এতে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলো। ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর আগে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো সাধ আছে তোমার? থাকলে বলতে পারো।
এদিকে খালা তার পুত্রতুল্য ছেলেটির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে বুক চাপড়ে কাঁদছিল। ছেলেটি ফাঁসির দড়িতে ঝোলার আগে বললো, আমি আমার খালার কানে কানে কয়েকটি কথা বলতে চাই।
তাকে এই অনুমতি দেওয়া হলো। তখন এক অন্যরকম কাণ্ড ঘটে গেল। সে খালার কানের কাছে মুখ নিয়ে তার কানের লতি কামড়ে ছিঁড়ে দিল।

তারপর বললো– খালা, আজ আপনিই আমার মৃত্যুদণ্ডের কারণ। প্রথম থেকে বদভ্যাস ত্যাগ করতে বললে আজ আমাকে এভাবে মরতে হতো না। কিন্তু আপনি কখনো আমাকে এসব করতে নিষেধ করেননি, বরং আরো বেশি উৎসাহিত করেছেন, প্রশংসা করেছেন।

শিক্ষা : শিশুদের ছোট থেকেই অন্যায় কাজে বাধা না দিলে, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে অন্যায়ের মাত্রা আরো বাড়তে থাকে।

লোভের পরিণতি

অনেক দিন আগের ঘটনা। থুরথুরে এক বুড়ো আর বুড়ি একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরে খুবই কষ্টে দিন কাটাতো। খুবই অভাবী ছিল তারা। তিন বেলা ঠিকমতো খাবারও জুটতো না। একদিন বুড়ি তাদের ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিল। তখন কী যেন তার সামনে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বুড়োকে ডাকলো।
বুড়ো দেখে অবাক হয়ে বললো, বাহ্ এটা কী পড়ে আছে! কেমন সোনালি রঙের, ঝকঝকে, বুকটা সাদা, ভুট্টার দানা! দানাটি বেশ বড়সড়। ভালো করে দেখি একবার। 'বুঝেছি' বলে বুড়ো লোকটা ভুট্টার দানাটি হাতে নিয়ে ইঁদুরের গর্তের কাছে গেল।
ইঁদুর বন্ধু! ইঁদুর বন্ধু! কোথায় তুমি! উপরে এসো। তোমার জন্য মজার একটি খাবার এনেছি। খুবই মজার খাবার, ভুট্টার দানা! এই নাও। আমার পেটে ক্ষুধা আছে তো, তাই আমি আরেকজনের ক্ষুধার কষ্টটা বুঝতে পারি। ইঁদুর বন্ধু! ইঁদুর বন্ধু...!
ইঁদুরের গর্ত থেকে ছোট্ট কয়েকটি ইঁদুর বেরিয়ে এসে বুড়োর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলো।
প্রথম ইঁদুর : বন্ধু, তুমি তো প্রতিদিন আমার জন্য কোনো না কোনো খাবার দিয়ে যাও। একেবারে আমার বাড়ির দরজায়। এ জন্যই ইঁদুর রাজ্যের সবাই তোমাকে ভালোবাসে। তুমি যাবে আমাদের রাজ্যে?

দ্বিতীয় ইঁদুর : আমরা কিন্তু ভাই তোমার বাড়ি পাহারা দেই। তোমার ঘরের চাল-ডাল, খাবার যাতে কেউ খেতে না পারে সে জন্য আমরা খুব খেয়াল রাখি। কেউ এলে দল বেঁধে তাড়িয়ে দেই। শুধু ঐ বিড়ালটাকে একটু ভয় পাই। ম্যাও ম্যাও ডাকটা শুনলে কলজেটা কেঁপে ওঠে। ওরে বাপরে, কেমন করে তাকিয়ে থাকে!

তৃতীয় ইঁদুর : আমরা এসেছি ইঁদুরদের পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে আর আমাদের দেশে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে। আমাদের রাজাও তোমাকে অনেক পছন্দ করেন, ভালোবাসেন।

বুড়ো : সত্যিই! সত্যিই বলছো? তোমাদের রাজা আমাকে খুব ভালোবাসেন? সত্যিই আমি আজ ভীষণ খুশি, অনেক খুশি। ধন্যবাদ ইঁদুর বন্ধুরা, ধন্যবাদ। কিন্তু কিভাবে আমি তোমাদের দেশে যাব?

চতুর্থ ইঁদুর : তুমি যদি তোমার চোখ দুটো বন্ধ করো, তাহলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ইঁদুরদের দেশে চলে যাবে।

এরপর বুড়ো চোখ বন্ধ করতে না করতেই ইঁদুরদের চেঁচামেচি শুনতে পেল। চোখ খুলতেই বুড়ো তো হতবাক হয়ে গেল!

বুড়ো : সত্যিই অবাক ব্যাপার, বাহ! ফুলে ফুলে ভরপুর কী চমৎকার বাগান! এতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাগান আমি জীবনেও দেখিনি। আমাকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? বাহ, কী সুন্দর প্রাসাদ! উনি কে? ইঁদুরদের বাদশাহ হবেন।

ইঁদুরের বাদশাহ : ইঁদুর রাজ্যে তোমাকে স্বাগতম। তুমি বুড়ো মানুষ। একজন গরিব মানুষ। তারপরও ইঁদুরদের প্রতি যে দয়া তুমি দেখিয়েছ, সেই দয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ বুড়ো।

বুড়ো : আমাকে তোমাদের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। তবে একটা কথা, আমাকে বুড়ো বলবে না। আমার বয়স মাত্র সত্তর বছর তিন মাস। এই বয়সেও আমি নিজের হাতে সব কাজ করি।

ইঁদুরের বাদশাহ : দুঃখিত বন্ধু, সত্যিই তো! নিজের কাজ যে নিজে করে সে তো বুড়ো হতে পারে না, আমাকে মাফ করে দাও বন্ধু! তবে তুমি কিন্তু আজ সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটাবে। তোমার যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াবে।

বুড়ো : ধন্যবাদ বন্ধু, আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।
এরপর রাত নেমে এলো। বুড়োর ফেরার সময় হয়ে গেল।
ইঁদুরের বাদশাহ : বন্ধু, এটা হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার। তবে একটা অনুরোধ। বাসায় না পৌঁছানো পর্যন্ত থলেটির মুখ খুলবে না।
এরপর বুড়ো চোখ বন্ধ করলো আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কানে শুনতে পেল বুড়ির কথা। বুড়ো খুশিতে চোখ মেলে দেখলো তার কুঁড়েঘরে এসে গেছে সে।
বুড়ো : জানো, খুবই আনন্দের একটি সংবাদ আছে। এই দেখো, এই থলের মধ্যে কী চমৎকার মুক্তা! এগুলো আমি উপহার পেয়েছি।
বুড়ি : অবাক ব্যাপার তো! কোত্থেকে পেলে? কী সুন্দর! আমাকে দাও আমি এই মুক্তাগুলো সবাইকে দেখিয়ে আসি। আমরা আর গরিব থাকবো না গো!
বুড়ো : এই খবরদার! একদম চুপ। এই খবর কাউকে জানানো যাবে না।
বুড়ি : কী বলছো! এত বড় একটা সুসংবাদ, কাউকে না জানালে হয়?
বুড়ো-বুড়ির চেঁচামেচিতে পাশের বাড়ির এক ধনী লোক বিষয়টি জেনে যায়। লোকটি তাদের ঘরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।
প্রতিবেশী বুড়ো : সে তো এখন আমার চেয়ে ধনী হয়ে যাবে। আমাকে সে এখন আর পাত্তাই দেবে না। আমিও ছাড়বো না। যে করেই হোক ঐ ইঁদুরের বাড়ি যেতেই হবে। গরিব বোকাটা আর কয়টা মুক্তা এনেছে। একবার যেতে পারলেই হয় ইঁদুর রাজ্যে। সব মুক্তা বস্তা ভরে নিয়ে আসবো। আমিই হবো সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী।
বুড়ো : বললাম তো, এই কথা বেশি জানাজানি করো না।
বুড়ি : তুমি আরেকবার যাও না গো। মাত্র দুই টুকরো মুক্তা দিল তোমাকে। ইঁদুরের রাজা আসলেই একটা কিপ্টে লোক। না হয় মাত্র দুই টুকরো মুক্তা কেউ কাউকে উপহার দেয়।
বুড়ো : আহা চুপ করো।
বুড়ি : এই এর পরেরবার যখন তুমি যাবে তখন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। থলে ভরে মুক্তা নিয়ে আসবো। আমি তোমার মতো এতো বোকা নই।

এরমধ্যে প্রতিবেশী বুড়ো এসে বললো, ভাই কিছু মনে করো না। তোমরা আমার প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও একদিনও তোমাদের খবর নেইনি। কী নিষ্ঠুর আমি! আমাকে মাফ করে দিয়ো। যাই হোক এই নাও, এখানে কিছু খাবার আছে। তোমাদের জন্য। শুধু তোমাদের জন্যই না, ইঁদুরের জন্যও এনেছি। আমি নিজ হাতে ইঁদুরকে খাওয়াতে চাই। আহারে! তুমি গরিব মানুষ! তোমার কুঁড়েঘরেই শুধু ইঁদুর আর ইঁদুর। আমার বাড়িতে যদি আসতো পেট পুরে খাওয়াতে পারতাম।

বুড়ি : বসুন বসুন। আপনি কষ্ট করে আমাদের ঘরে এসেছেন। আপনি নিজ হাতে ইঁদুরদের ভুট্টা খেতে দিন।

প্রতিবেশী বুড়ো : ধন্যবাদ ধন্যবাদ, শুধু আপনিই কেবল আমার দুঃখটা বুঝতে পেরেছেন।

এই নাও ইঁদুর বাবাজি, পেট ভরে খাও, খাও খাও! শুধু একটা অনুরোধ, আমি তোমাদের দেশে যেতে চাই। তোমাদের রাজাকে নিজ হাতে ভুট্টা খাওয়াতে চাই। দোহাই তোমাদের, শুধু আমার একটা অনুরোধ রাখো।

পঞ্চম ইঁদুর : ঠিক আছে। তোমাকেও আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাব। আগে চোখ বন্ধ করো।

প্রতিবেশী বুড়ো : এই যে আমি চোখ বন্ধ করলাম।

ইঁদুরদের শব্দ শুনে চোখ মেলতেই চমৎকার সেই রাজ্যটি দেখতে পেল। কিন্তু বুড়োর সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। কেবল অপেক্ষায় ছিল কখন দিন শেষ হবে, রাত আসবে আর মূল্যবান উপহার মুক্তাগুলো পাবে।

ইঁদুরের বাদশাহ : আমাদের রাজ্যে স্বাগতম হে পৃথিবীর মানুষ! তুমি চাইলে আমাদের সারা রাজ্য ঘুরে দেখতে পারো। আশা করি আমাদের রাজ্য তোমার ভালো লাগবে।

প্রতিবেশী বুড়ো : ইয়ে একটু তাড়াতাড়ি করুন, আমার হাতে একদম সময় নেই, যদি কোনো উপহার থাকে, দিয়ে দেন আমি চলে যাই। ঘোরাঘুরির সময় আমার নেই।

এ কথা বলে বুড়ো লোকটা বাদশাহর দিকে তাকালো। সে দেখলো তার পাশে বড় একটা পাত্রে মুক্তা ভর্তি করা। চোখ ধাঁধিয়ে গেল বুড়োর। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকলো। হঠাৎ একটা দুষ্ট বুদ্ধি খাটালো বুড়ো। বিড়ালের মতো করে ডাক দিতে শুরু করে দিলো সে।

ম্যাও ম্যাও.. ম্যাও ম্যাও.. । ম্যাও ম্যাও.. ম্যাও ম্যাও.. ।
ইঁদুরের বাদশাহ : পালাও, পালাও সবাই! পালাও, পালাও!
প্রতিবেশী বুড়ো : এই তো সব বেটা পালিয়েছে। এবার সব মুক্তা আমার। কী ব্যাপার আলো কোথায়? একবারে অন্ধকার হয়ে গেল যে!
ইঁদুরগুলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সব আলো চলে গেল যে! পাখিদের ডাকাডাকিও তো বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে কেমন নিঃসীম অন্ধকার।
অদ্ভুত ব্যাপার! যেই পাত্রে এতো উজ্জ্বল মুক্তাগুলো ছিল, সেই পাত্র থেকে মুক্তাগুলোও উধাও হয়ে গেল। আমার আশাই পূরণ হলো না, বুদ্ধিটাও বিফলে গেল। শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ঘরে ফিরে যেতে হবে।
কিন্তু কিভাবে যাব! ইঁদুরগুলো তো পালিয়ে গেছে, এখন আমাকে পথ দেখিয়ে কে নিয়ে যাবে? কে বাড়িতে পৌঁছে দেবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে?
কাজটা আমি ঠিক করিনি। লোভের কারণেই আজ আমার এই পরিণতি। অন্ধকারের মধ্যে কিভাবে আমি বাড়ি যাব। আমাকে সাহায্য করার মতো একটি ইঁদুরও তো দেখতে পাচ্ছি না। মুক্তার অতিরিক্ত লোভে এখন আমার জীবনটাই হারাতে হবে।

শিক্ষা : লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

ঠাণ্ডা-গরম

এক পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে এক লোক এসে বললো, পণ্ডিত সাহেব! শুনেছি আপনি অনেক জ্ঞানী মানুষ। আপনার অনেক বুদ্ধি। তাই আমি এলাম আপনার কাছে কিছু শিখবো বলে।
পণ্ডিত বললেন, ঠিক আছে শিখতে চাইলে বসুন এখানে।
লোকটি বসলো।

কিছুক্ষণ পর পণ্ডিতের স্ত্রী একটি বাটিতে করে জ্বালানো কয়লা দিয়ে গেলেন রুম গরম করার জন্য। কয়লা যখন নিভু নিভু তখন আগুনের তাপ বাড়ানোর জন্য পণ্ডিত সেই কয়লায় ফুঁ দিতে লাগলেন। তখন লোকটি বললো, হুজুর কয়লায় ফুঁ দিচ্ছেন কেন?

উত্তরে পণ্ডিত বললেন, এতে আগুন বাড়ে আর রুম গরম হয়।

শুনে লোকটি বললো, যাক একটা নতুন জিনিস শিখলাম। ফুঁ দিলে গরম হয়।

কিছুক্ষণ পর পণ্ডিতের স্ত্রী দুই কাপ চা দিয়ে গেলেন। পণ্ডিত চা খাওয়ার সময় আবার ফুঁ দিতে লাগলেন। তাই দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, এখন ফুঁ দিচ্ছেন কেন?

জবাবে পণ্ডিত বললেন, এতে চা ঠাণ্ডা হয়।

শুনে লোকটি অবাক হয়ে বললো, এটা কেমন কথা? একটু আগে বললেন ফুঁ দিলে গরম হয়। এখন আবার বলছেন ফুঁ দিলে ঠাণ্ডা হয়। একই মুখে দুই রকম কথা! আপনি দেখছি আমার থেকেও বোকা। আপনার কাছে কিছু শিখবো না। আমি গেলাম।

শিক্ষা : উস্তাদের চেয়ে শাগরেদ বেশি বুঝলে কিছু শেখা যায় না।

নাস্তিক নাপিত ও মুসলমান

একদিন এক মুসলমান চুল কাটাতে একটি সেলুনে ঢুকলো। সেলুনের নাপিত ছিল নাস্তিক। সে চুল কাটার সময় মুসলমান লোকটিকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই। নাপিত বললো, যদি ঈশ্বর বলতে কেউ থাকতো, তাহলে এতো মানুষ না খেয়ে মারা যেত না। তখন সে বাইরে একজন বস্ত্রহীন মানুষকে দেখিয়ে বললো, যদি ঈশ্বর থাকতোই, তাহলে ঐ লোকটির গায়ে কাপড় নেই কেন? সে না খেয়ে থাকে কেন?

মুসলমান লোকটা তখন কিছুই বললো না। নাপিতের কথা চুপচাপ শুনে যেতে লাগলো। এক সময় তার চুল কাটা শেষ হলে সে বাইরে গেল এবং নাপিতকে বাইরে ডেকে বললো, এই এলাকায় কোনো নাপিত নেই?
নাপিত তার কথায় অবাক হয়ে বললো, নাপিত না থাকলে আপনার চুল কাটলো কে?
তখন মুসলমান লোকটা কতগুলো লম্বা চুলওয়ালা লোককে দেখিয়ে বললো, নাপিত থাকলে ঐ লোকগুলোর চুল এতো লম্বা কেন?
নাপিত বললো, তারা তো আমার কাছে আসতে হবে। আমার কাছে না আসলে, আমাকে না বললে, আমি কি কিছু করতে পারবো?
তখন মুসলমান লোকটা বললো, তেমনি সৃষ্টিকর্তার কাছে না গেলে, সৃষ্টিকর্তাকে না ডাকলে, তিনি তোমার জন্য কী করবেন বলো?
তখন নাস্তিক নাপিত বেক্কলের মতো 'হা' করে তাকিয়ে রইলো।

শিক্ষা : নাস্তিকদের ধরন অনুযায়ী তাদের কথার জবাব দেওয়ার জন্য আস্তিকদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও উপস্থিত বুদ্ধি অর্জন করা প্রয়োজন।

সম্পদের সঠিক বণ্টন

এক ব্যক্তি তার তিন মেয়ে রেখে মারা গেলেন। তাদের মধ্যে এক মেয়ে বেপরোয়া, তবে সুন্দরী। সে তার চোখের মায়াবী চাহনি দিয়ে অনেক পুরুষকেই ঘায়েল করে থাকে। দ্বিতীয় মেয়েটি খুব হিসাবী, চড়কায় উল বুনতে জানে। তৃতীয়টি আস্ত একটা মদখোর, দেখতেও ভালো নয়।
ভদ্রলোক মরার আগে তার স্ত্রীকে উইলের অছি বা ট্রাস্টি নিযুক্ত করে যান। এতে নির্দেশ দেওয়া আছে, তার সম্পত্তি এমন সমানভাবে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, যেন তারা তাদের সম্পত্তি নষ্ট না করতে পারে। আর যদি মেয়েরা সম্পত্তি না রাখতে চায়, তবে তারা প্রত্যেকে তাদের মাকে একহাজার টাকা করে দিতে হবে।

এই উইলের খবরটা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। মা তো মুশকিলে পড়লেন। আইনজীবীদের বাড়িতে ঘুরতে লাগলেন তার স্বামীর উইলের বিষয়ে বোঝার জন্য। কিন্তু কেউ কোনো সমাধান দিতে পারলেন না। সত্যিই তো, মেয়েরা যদি সম্পত্তি না চায় বা সেই সম্পত্তি ভোগ করতে না পারে, সে ক্ষেত্রে এমন কোনো নগদ টাকার ব্যবস্থা নেই, যা দিয়ে তারা মায়ের প্রাপ্য পরিশোধ করতে পারবে।

অনেক দিন অনেক রকম চিন্তাভাবনা করেও যখন উইলের মর্মার্থ বোঝা গেল না, তখন মা ঠিক করলেন, তার ইচ্ছামতোই তিনি এই সম্পত্তি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন। তিনি সম্পত্তির হিসাব কষতে বসলেন। মা তার বেপরোয়া সুন্দরী মেয়েটার ভাগে দিলেন ভালো ভালো পোশাক, দামি অলংকার আর সেই সঙ্গে কাজের জন্য দাসী আর বালক ভৃত্যদের। পরিশ্রমী ও হিসাবী মেয়ের ভাগে দিলেন জমিজমা, গরু-ভেড়া, খামার বাড়ি, লাঙল-বলদ, চাষের যন্ত্রপাতি, চাষী ইত্যাদি। আর মাতাল, দেখতে ভালো নয় মেয়ের ভাগে দিলেন মদের ভাণ্ডার, পিপেভর্তি আঙুরের মদ, বাগানসহ একটা বড় বাড়ি।

মা যখন প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের মতামত নিয়ে মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী এভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দেবেন ঠিক করেছেন, তখন তাদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক গল্পকার ঈশপ।

ঈশপ সব শুনে বললেন, এটা তোমরা কী করছো? ভদ্রলোকের উইলের মর্ম তোমরা কেউ বুঝতে পারোনি। হয়তো ভদ্রলোক এই কাণ্ড দেখে কবরে কষ্ট পাচ্ছেন।

সবাই অবাক হয়ে জানতে চাইলো, তাহলে কী করতে হবে?

ঈশপ বললেন, এটা তো অতি সোজা কাজ। বাগানসহ বড় বাড়ি, মদের ভাণ্ডার হিসাবী পরিশ্রমী মেয়েটিকে দেওয়া হোক। সাজ-পোশাক, হীরা-মুক্তা-অলংকার, দাসদাসী সব দেওয়া হোক দেখতে ভালো না মাতাল মেয়েটিকে। আর জমিজমা, পশুর পাল, লাঙল ইত্যাদি দেওয়া হোক সুন্দরী বেপরোয়া মেয়েটিকে। তাহলে তিন মেয়ে তাদের স্বভাব অনুযায়ী এই রকম সম্পত্তি পাওয়া পছন্দ করবে না। দেখতে ভালো নয় মাতাল মেয়েটি সাজ-পোশাক সব বিক্রি করে দেবে মদ কেনার জন্য। সুন্দরী মেয়েটি জমিজমা বিক্রি করবে সাজ-পোশাকের জন্য। আর হিসাবী

পরিশ্রমী মেয়েটি বড় বাড়ি, বাগান সব বিক্রি করে চাষবাসের জমি কিনবে। তাই যে মেয়ে যা পেয়েছিল কিছুই রাখবে না। যার যার জিনিস বিক্রি করে নগদ টাকা জোগাড় করবে, আর তা থেকে তাদের মাকে তার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেবে।

শিক্ষা : কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের প্রয়োজন হয়।

সেদিনের জবাব

খতিবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহ.) এদেশের প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আমলে একজন সফল সংসদ সদস্য ছিলেন। একদিন তিনি সংসদে গিয়ে দেখেন, কিছু সংসদ সদস্য এক জায়গায় বসে চা পান করছেন। তাদের মধ্যে একজন বাঁ হাতে চা পান করছিলেন। খতিবে আযম তাকে বাঁ হাতে চা পান করতে নিষেধ করলেন। এর জবাবে সংসদ সদস্য হযরতকে ব্যঙ্গ ও তিরস্কার করে বললেন– মোল্লাজি, এইসব ফতোয়াবাজি ছাড়েন। ডান হাত আর বাঁ হাত শরীরেরই অংশ, সবকিছু আল্লাহই বানিয়েছেন। এক হাত দিয়ে পান করলেই চলে।

কথাগুলো খতিবে আযমের মনে কাঁটার মতো লাগলো। কিন্তু সেদিন তিনি এর কোনো জবাব দিলেন না।

যথানিয়মে পরে একদিন খতিবে আযম সংসদে গেলেন। তখন ওই সংসদ সদস্য খতিবে আযমকে দেখে সালাম দিলেন। খতিবে আযম তখন পা উঠিয়ে সালামের জবাব দিলেন। এতে সংসদ সদস্য যারপর নাই রেগে গেলেন। তখন খতিবে আযম বললেন, ভাই! হাত-পা শরীরেরই অংশ। আর সবকিছু আল্লাহই বানিয়েছেন। তাই হাতের বদলে পা দিয়ে সালামের জবাব দিলে অসুবিধা কী?

এ কথা বলতেই সদস্য একেবারে চুপসে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এটি তারই সেদিনের কথার জবাব।

শিক্ষা : ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

বোকার হাড্ডি

এক বোকার গল্প। সে একদিন একটি গাছের মগডালে বসে ডালের গোড়া দিয়ে কাটছিল। একজন লোক তা দেখে বললো, ভাই! আপনি তো পড়ে যাবেন।
সে রেগে গিয়ে বললো, এই মিয়া! তুমি কি গায়েব জানো? তুমি অদৃশ্যের খবর রাখো? আগাম খবর বলতে পারো? যাও এখান থেকে।
লোকটি কষ্ট পেয়ে চলে গেল।
একটু পরে বোকা লোকটি ডালসুদ্ধ গাছ থেকে পড়ে গেল। তখন বোকা দৌড়ে সেই লোকটির কাছে গিয়ে তার পায়ে পড়লো। বললো, ভাই! আপনি বলে দিন, আমার মৃত্যু কবে হবে।
লোকটি বললো, ভাই! আমি তো জানি না। আল্লাহ জানেন।
বোকা লোকটি বললো, আপনি জানেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন আমি গাছ থেকে পড়ে যাব। সত্যিই আমি পড়ে গেলাম। আপনি না বললে আপনার পা ছাড়বো না।
তখন তার থেকে মুক্তি পেতে লোকটি বানিয়ে বললো, ভাই! আপনার যখন লাল সুতা বের হবে, তখন আপনার মৃত্যু হবে।

এ কথা শোনার পর বোকা লোকটি তার পা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে চলে গেল। গিয়ে তার স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বললো। স্ত্রী তাকে অভয় দিল।
একদিন বোকা লোকটি যখন কোট পরতে যাবে, তখন কোট থেকে লাল সুতা বের হলো। তা দেখে সে চিৎকার করে বললো, বউগো! আমি মরে গেছি। তুমি আমাকে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করো। তবে মুখ বন্ধ করে কবর দিও না। তাহলে নিঃশ্বাস নিতে পারবো না। আর মাঝে মাঝে আমার জন্য খাবার পাঠাবে। নইলে ক্ষুধায় কষ্ট পাবো।
স্ত্রীও বোকা ছিল। বললো, আচ্ছা তাই করছি।
এরপর তাকে বাগানের মধ্যে কবর দিয়ে এলো।
রাতের বেলা সাতজন চোর এই বাগানের ভেতর দিয়ে রাজার বাড়িতে চুরি করতে যাচ্ছিল। একজন চোরের গোবরের মধ্যে পা পড়লো। এতে তার পা নষ্ট হয়ে গেল। তখন পা কোথায় মুছবে খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ

দেখলো সামনে ঘাসের মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। এরপর ঘাস মনে করে সে বোকা লোকটির মাথার চুলে পা মুছতে লাগলো।
তখন বোকা লোকটি গোবরের গন্ধে চেচিয়ে উঠলো। চোর এতে ভিমড়ি খেয়ে গেল। এরপর তাকে টেনে ওঠালো। তার শরীর পরিষ্কার করে দিয়ে বললো, তুমি এখানে কী করছো?
সে বললো, আমি তো মরে গেছি।
চোরেরা বললো, তুমি কিভাবে বুঝলে তুমি মরে গেছ?
বোকা লোকটি সব ঘটনা খুলে বললো। চোরেরা বুঝলো, লোকটি হদ্দ বোকা। তখন তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশে বললো, তুমি আমাদের কথামতো কাজ করলে, আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে দিব। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।
বোকা লোকটি বাঁচার আশায় তাদের সঙ্গে চললো।
চোরগুলো বোকা লোকটিকে বললো, তুমি রাজার মাথা থেকে মুকুটটি নিয়ে আসো।
চোরদের কথামতো সে রাজার মুকুট আনতে চলে গেল। রাজা যে রুমে ঘুমাচ্ছিলেন সেই রুমে মশারি টানানো ছিল। কিন্তু সে মশারি চিনতো না। তাই মশারি দেখে ভাবনায় পড়ে গেল যে, এর ভেতরে কী করে ঢুকবে? তখন সে চোরদের কাছে এসে বললো, ঘরের ভেতর ঘর, তার মধ্যে রাজা ঘুমিয়ে আছে। তার কোনো দরজা নেই। আমি সেখানে কিভাবে ঢুকবো?
তখন চোরেরা বিষয়টি বুঝে বললো, তুমি তা উঠিয়ে ভেতরে ঢুকবে।
এরপর সে গিয়ে মশারির পরিবর্তে খাট ধরে টানাটানি শুরু করলো। কিন্তু খাট নাড়াতে পারলো না। তখন আবার চোরদের কাছে এসে বললো, সেটা এতো ভারী যে, আমি ওঠাতে পারি না।
চোরেরা বললো, নিচের শক্তটা বাদ দিয়ে উপরের কাপড় উঠিয়ে ঢুকবে।
এবার সে ঢুকতে পারলো। তখন ছিল শীতকাল। রাজা মাথা ছাড়া পুরো শরীরে কম্বল পেঁচিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। বোকা লোকটি ভাবলো, রাজাকে তার মতো মাথা ছাড়া কবর দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি রাজা মরে গেছে? দেখতে হবে রাজার লাল সুতা বের হয়েছে কিনা।
সে রাজাকে ডেকে তুললো। রাজা তাকে দেখে 'চোর চোর' বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

বোকা লোকটি বললো, রাজামশাই! আমি চোর নই। আপনাকে একটা কথা বলার জন্য জাগিয়েছি।
রাজা বললেন– কী কথা, বলো তাড়াতাড়ি!
সে বললো, আপনার কি লাল সুতা বের হয়েছে?
রাজা বললেন, কেন!
সে বললো, কারণ আপনি মুখ ছাড়া পুরা শরীর কবর দিয়ে রেখেছিলেন।
রাজা বললেন, তার মানে?
তখন লোকটি সব ঘটনা খুলে বললো।
সব বুঝতে পেরে রাজা চোরগুলোকে ধরে শাস্তি দিলেন এবং বোকা লোকটিকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

শিক্ষা : সমাজে চলার জন্য বুদ্ধিমান হতে হয়, এমন বোকা হলে চলে না।

বিরানী বাজার

আরেক বোকা লোক ঢাকা শহরে তার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে এলো। মেহমান আসাতে বাসায় বিরিয়ানী রান্না করা হলো। কিন্তু ঘরোয়া বিরিয়ানী তার পছন্দ হলো না। তাই সে বেরিয়ে পড়লো বাজারের বিরিয়ানীর খোঁজে।
হাঁটতে হাঁটতে সে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে চলে এলো। বাসের হেলপাররা যাত্রী তোলার প্রতিযোগিতায় নেমে আছে। যাকে তাকে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবেন ভাই?
বোকা লোকটি কাছে আসতেই এক হেলপার জানতে চাইলো, কোথায় যাবেন? সে বললো, বিরানী বাজার যাব। লোকটির জিহ্বা ভারী ছিল। তাই বিরানী বাজারের স্থলে বিয়ানী বাজার শোনা গেল।
বিয়ানী বাজার তো সিলেটে। হেলপার তার যাত্রী পেয়ে ডায়ালগ ছাড়তে আরম্ভ করলো, সিট আছে, উঠে পড়ুন। বাস এখনই ছেড়ে দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোকটি খুশি মনে বাসে চড়ে বসলো। মনে মনে ভাবলো, যাক ভালোই হলো, আমি তো বিরানীর দোকান চিনি না। বাসই আমাকে দোকানে পৌঁছে দিবে।
কিন্তু বাস চলছে তো চলছেই। কোথাও থামবার নাম নেই। ঘণ্টাখানেক চলার পর লোকটি অস্থির হয়ে উঠলো। বোকা হলেও ভাবলো, বিরানী বাজার যেতে এতক্ষণ তো লাগার কথা নয়! পাশে বসা লোকটির কাছে চানতে চাইলো, ভাই পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?
লোকটি জানতে চাইলো, আপনি যাবেন কোথায়?
সে বললো, বিরানী বাজার যাব।
কিন্তু সেও বাসের আওয়াজে শুনলো, বিয়ানী বাজার। তাই আশ্বাসের সুরে বললো, গাড়ি যেভাবে ছুটছে, চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি তো লাগবেই না।

তার কথা শুনে বোকা লোকটি যেন আকাশ থেকে পড়লো। কাচুমাচু করে আবার জিজ্ঞেস করলো, ভাই! তার আগে কি কোনো বিরানী বাজার নাই?
এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে লোকটি একটু রেগে গিয়ে বললো, মিয়া! বিয়ানী বাজার দেশে কয়টা আছে?
সেও জোর গলায় বললো, বহুত আছে।
তাদের আওয়াজ শুনে আশপাশের কয়েকজন সেখানে এসে জড়ো হলো। একলোক রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলো, সেখানে যাবেন কেন?
সে বললো, বাসার বিরানী মজা লাগে না। তাই বাজারের বিরানী খাইতে যাইতেছি।
তার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। বুঝতে পারলো, আসল সমস্যা তার মুখে। এরপর বাস থামিয়ে তাকে ঢাকায় ফেরত পাঠিয়ে দিল।

শিক্ষা : অজানা-অচেনা স্থানে এভাবে বেরিয়ে পড়া উচিত নয়। আর যে কোনো বিষয় ভালো করে বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত।

গল্পের আসর

এক ছিল সুখময় রাজ্য। সে দেশের বাদশাহ ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ভীষণ অনুরাগী। ছিলেন কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক। একবার হঠাৎ করে সেই বাদশাহর গল্প শোনার ইচ্ছা হলো। তিনি নিজের ইচ্ছা রাণীর কাছে বলার পর রাণী রাজি হলেন। রাণী বললেন, দেশের শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের একত্র করে সবার গল্প শুনুন এবং যার গল্প সবচে ভালো হয় তাকে পুরস্কৃত করুন।

বাদশাহ রাণীর পরামর্শ মেনে নিলেন। দেশের সেরা গল্পকারদের কাছে দাওয়াতনামা পৌঁছে দেওয়া হলো। শুরু হলো আয়োজন। বাদশাহর ইচ্ছা পূরণ বলে কথা।

সে দেশের বাদশাহ ও জনগণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও দেশের কবি-সাহিত্যিক ও গল্পকারদের অধিকাংশই ছিল অমুসলিম। মুসলিম গল্পকার ছিল খুব কম। তবে একেবারেই যে ছিল না, তা নয়। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন নামকরা মুসলমান গল্পকার। দাওয়াত থেকে বাদ পড়েননি তিনিও।

নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে রাজদরবারে শুরু হলো গল্পকারদের আগমন। বাঘা বাঘা সব গল্পকার। দেশব্যাপী সুখ্যাতি তাদের। এক সময় মুসলমান গল্পকারও এলেন। তবে অন্যদের মতো এতো ভাব নিয়ে নয়। তিনি এলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো।

শুরু হলো গল্পের আসর। বিচারক স্বয়ং বাদশাহ। প্রতিযোগী শ্রেষ্ঠ সব গল্পকার। একে একে সবাই খুব আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে নিজ নিজ গল্প পাঠ করলেন। কেউ বীরত্বের গল্প, কেউ প্রেমের গল্প, কেউ বিরহ-বিচ্ছেদের গল্প আর কেউবা ভূত-পেত্নী বা রাক্ষসের ভয়ংকর গল্প। সবার শেষে দাঁড়ালেন মুসলমান গল্পকার। বাদশাহকে সালাম দিয়ে তিনি তার গল্প শুরু করলেন। এক পীর ও মুরিদের গল্প। তিনি বলতে লাগলেন–

এক দেশে বাস করতেন এক বুযুর্গ আলেম। আল্লাহওয়ালা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। ছিল লাখ লাখ মুরিদ। এক মুরিদকে খেলাফত দেওয়ার সময় তাকে তিনটি উপদেশ দিলেন। উপদেশ তিনটি হলো–

এক. কখনো প্রভুত্ব দাবি করো না। দুই. নবুওয়তি দাবি করো না এবং তিন. নিজেকে পিঁপড়ায় পরিণত করো না।

পীর সাহেবের এই আশ্চর্য উপদেশ শুনে মুরিদ তার কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারলো না। মুরিদ বললো, হযরত! আমার ব্যাপারে যখন আপনার এতটাই আশঙ্কা, আমার ওপর এতটাই অনাস্থা, তাহলে খেলাফত কেন দিচ্ছেন? আমি আরো কয়েক বছর আপনার সাহচর্যে থেকে গেলেই কি ভালো হয় না?

জবাবে পীর সাহেব বললেন, শোনো! আসলে তুমি আমার উপদেশ বুঝতে পারোনি। আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি কখনো এমন কথা বলো না যে, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। কেননা, এ কথার মাধ্যমে এক রকম প্রভুত্বই দাবি করা হয়। দ্বিতীয় উপদেশ হলো, কখনো শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে কোনো কথা বলো না। কেননা, কোনো কথার শতভাগ নিশ্চয়তা শুধু নবীগণই দিতে পারেন। তৃতীয় উপদেশ হলো, নিজেকে কখনো উঁচু পর্যায়ের লোক মনে করো না। কেননা, একটি ঈগল যখন মাটিতে থাকে, তখন তাকে দেখতে যেমন বিশাল দেখায়, আকাশে ওড়ার পরও কি তেমন দেখা যায়? না, যত উপরে উঠে, আমাদের দৃষ্টিতে ততই ছোট হয়। তেমনই মানুষ। সে যখন নিজেকে বড় মনে করে, তখন মানুষের দৃষ্টিতে সে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এভাবে একপর্যায়ে পিঁপড়ার যেমন মূল্য নেই, মানুষের কাছেও তার কোনো মূল্য থাকে না। সে হয়ে পড়ে মূল্যহীন, অপদার্থ।

মুসলমান গল্পকারের গল্প শুনে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কয়েকজন অমুসলিম গল্পকার চেঁচিয়ে উঠে বললো, মহামান্য বাদশাহ! এটা কোনো গল্প হলো নাকি? প্রেম নেই, বিরহ নেই, নেই হাসি-কান্না। এটাকে গল্প বলে? এমন গল্পকারকে দাওয়াত করাই উচিত হয়নি।

বাদশাহ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন মুসলমান গল্পকারের দিকে। তিনি বুঝতে পেরে বলতে লাগলেন, মহামান্য বাদশাহ! আমি এ দেশের নাগরিক, তাই আপনাকে ভালোবাসি। একজন সুশাসক হিসেবে আপনাকে হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা করি। আমি চাই, আপনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকেন দীর্ঘদিন ধরে। তাই আপনাকে এ উপদেশ গল্প শোনানো। কারণ, গল্পের উপদেশগুলো থেকে কেউ যদি কোনো একটি উপদেশও অবজ্ঞা করে,

তাহলে এই ধরায় তার স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ জাগবে। আর শাসক হিসেবে আপনার মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকার আশংকা বেশি। আপনি যেন আমাদের মাঝে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারেন সেজন্য এই গল্পটি বলা...।
বাদশাহ এখন উৎফুল্ল, তাকে মনে হচ্ছে প্রাণবন্ত। তিনি মুসলমান গল্পকারের সাহস ও বুদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। দান করলেন দেশসেরা গল্পকারের গৌরবময় উপাধি।

শিক্ষা : স্থান-কাল-পাত্র দেখে কথা বললে অনেক কাজে দেয়। যেখানে–যখন–যার জন্য যে গল্প বা কথা উপযোগী সেটা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সেভাবেই নসিহত পেশ করতেন।

ডাক্তারের সংখ্যা বেশি

একদিন বাদশাহ আকবর তার উজির বীরবলকে ছাড়াই ছদ্মবেশে দিল্লির রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাদশাহ জানতেন, বীরবল দিল্লির ছেলে-বুড়ো সবার কাছে পরিচিত। তাকে নিয়ে ছদ্মবেশে বেড়ানো সম্ভব নয়।
রাস্তায় যেতে যেতে তিনি দেখলেন, এক জায়গায় মানুষের জটলা বেঁধে আছে। একটা লোককে ঘিরে খুব হইচই হচ্ছে। তিনি বেশ কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, এক লোক ভিখারীদের কিছু পয়সা বিলিয়ে দিচ্ছে, তাকে ঘিরেই ভিখারীদের এই হট্টগোল। এ দৃশ্য দেখে বাদশাহর মনে খুব দুঃখ হলো। দিল্লিতে এত ভিখারী আছে, তা তিনি জানতেন না। ভিক্ষার জন্য মানুষকে এভাবে ঘিরে ধরতেও এর আগে তিনি দেখেননি।

এ ঘটনার কথা বাদশাহ অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি। একদিন কথায় কথায় বীরবলকে সব খুলে বললেন। আরো বললেন, সে দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, পুরো দিল্লি যেন ভিখারীতে ছেয়ে গেছে। দিল্লিতে ভিখারীর সংখ্যাই বেশি।

বীরবল বললেন, না জাহাঁপনা, দিল্লিতে ভিখারীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি। তাদের তুলনায় ভিখারীর সংখ্যা অনেক কম।

বীরবলের কথায় বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন, ডাক্তারের সংখ্যা বেশি না বলে রোগীর সংখ্যা বেশি বললেও মেনে নিতে পারতাম। আমি ফরিয়াদ শুনেছি, দেশে ডাক্তারের অভাবে অনেক প্রজা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আর তুমি কিনা বলছো, রোগীর চেয়ে ডাক্তার বেশি।

বীরবল বললেন, হ্যাঁ জাহাঁপনা। আমি ঠিকই বলেছি। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা সত্যিই বেশি।

বাদশাহ বললেন, হাতে-নাতে প্রমাণ না পেলে আমি তা বিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুদিন পরের কথা। একটা জরুরি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হবে দরবারে। বাদশাহ দেখলেন, আমির-উমারা সবাই এসেছেন, কিন্তু বীরবল নেই। অথচ বীরবলকে বাদ দিয়ে সেদিনের আলোচনা চলতে পারে না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল তো এখনও এসে পৌঁছালো না।

দরবারের কোনো একজন বললো, তিনি অসুস্থ। না এসে পারলে তিনি আজ আসতে চান না।

বাদশাহ বলে উঠলেন– না না, তা হয় না। আজকে তাকে হাজির থাকতেই হবে। আমার কথা বলে এক্ষুণি তাকে খবর দাও।

সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হলো বীরবলের বাড়িতে। একটু পরেই অসুস্থ বীরবল এসে হাজির। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর একটা মোটা কম্বলে ঢাকা। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অবস্থা দেখে। বাদশাহ আকবরই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এমন হলো কেন বীরবল?

বীরবল বললেন, হুজুর! কী আর বলবো। সর্দিতে বড় জব্দ করেছে আমাকে। একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে আজ চরমে উঠেছে।

বাদশাহ হেসে বললেন, সর্দি আবার একটা রোগ হলো নাকি! হাতে-পায়ে সামান্য সরষের তেল মালিশ করলেই একদিনে সর্দি সেরে যায়।

উমারাদের একজন বললেন, গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে এতে পা ডুবিয়ে রাখলে সর্দি পালাবার পথ পায় না।

দরবারের আরেক কোণ থেকে একজন বলে উঠলেন, লবণ-তেল কিছুই দরকার নেই; সর্দি সারাতে সামান্য একটি কাঠি দিয়ে সর্দি সারানো যায়।

নাকে কাঠি দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে হয়। সুড়সুড়ি দিলেই হাঁচি পায়। এমনি করে কয়েকবার হাঁচলেই সর্দি সেরে যাবে।
এমনি করে দরবারে সেদিন যারা উপস্থিত ছিলেন, সবাই বীরবলকে সর্দি সারাতে একটা না একটা উপায় বলে দিতে লাগলেন।
বীরবল তখন কম্বলটা খুলে রেখে হাসতে হাসতে বললেন, জাহাঁপনা! সেদিন আপনি বলেছিলেন দিল্লিতে ভিখারীর সংখ্যা সবচে বেশি। আমি বলেছিলাম ডাক্তার বেশি। আমার কথাই যে সত্যি, আজকে বোধ হয় হাতে-নাতে প্রমাণ পেলেন। রোগী আমি একা, ডাক্তার আপনারা সবাই। জাহাঁপনা নিজেও একজন ডাক্তার বনে গেছেন।
বীরবলের কথা শুনে বাদশাহ মাথা নাড়ালেন এবং তার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন।

শিক্ষা : গ্রন্থগত বিদ্যার বাইরেও অনেক জ্ঞান রয়েছে। এর একটি হলো সাধারণ জ্ঞান। কখনো কখনো সাধারণ জ্ঞান খাটিয়েও মানুষ জয়ী হতে পারে।

দরবেশ ও নারী

অনেক দিন আগের কথা। গ্রামের এক যুবতী নারী একটু দূরের এক কূপ থেকে পানি তুলছিল। তার পাশ দিয়ে এক দরবেশ হেঁটে যাচ্ছিলেন। যুবতীকে দেখে তার মনে হলো, এই নারী জাতির মাঝে এমন কী শক্তি ও ছলনা রয়েছে, যা দ্বারা তারা বাদশাহকে ফকির, বীরকে ভীরু, আলেমকে জাহেল, পাথরকে মোম, বৃদ্ধকে যুবক বানিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে? তখন দরবেশ যুবতীর কাছে এসে জানতে চাইলেন– মা, তোমরা কিভাবে পুরুষদের সঙ্গে ছলনা করো? এমন কী ক্ষমতা রয়েছে তোমাদের কাছে?

দরবেশের কথা শুনে যুবতী তার শাড়ির অর্ধেক খুলে ফেললো। চুলগুলো এলোমেলো করে নিল। এরপর 'আমাকে বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার জুড়ে দিল। দরবেশ তখন মেয়েটিকে বললো– মা, আমি তোমার কাছে

একটা জিনিস জানতে চাইলাম, আর তুমি কিনা আমার সঙ্গে ছলনা করে, আমাকে এখন মানুষের হাতে মার খাওয়াবে। তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, এটাই কি তোমাদের আসল রূপ?

ওদিকে লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসছে। যখন মেয়েটি লোকদের ছুটে আসতে দেখলো, তখন সে কূপ থেকে এক বালতি পানি তুলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীরটা ভিজিয়ে নিল এবং দরবেশের কাপড়ও কিছু ভিজিয়ে দিল। এরপর বসে বসে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো।

লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করলো– মা, তোমার কী হয়েছে?

মেয়েটি বললো, আমি কূপে পড়ে গিয়ে চিৎকার করছিলাম, তখন এই দরবেশ আমাকে কষ্ট করে কূপ থেকে উঠিয়েছেন, তা না হলে আমি তো আজ মরেই যেতাম।

তখন লোকেরা দরবেশকে বাড়ি নিয়ে অনেক আপ্যায়ন ও সম্মান করলো। যখন তিনি চলে আসবেন তখন মেয়েটি এসে বললো, হুজুর! আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন? নারীজাতি এভাবেই পুরুষদেরকে শিকার করে থাকে। তাই সব সময় নারীদের ছলনা থেকে দূরে থাকবেন। নাগিনীর ছোবল খেয়েও অনেক মানুষ বেঁচে যায়। কিন্তু ছলনাময়ী নারীর ছোবল থেকে বেঁচে থাকা বড় কঠিন।

শিক্ষা : নারী ও পুরুষ পরস্পরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। বেগানা নারী-পুরুষের ফাঁদ থেকে পরস্পরের দূরে থাকতে হবে। তবে ইসলাম ও দেশের ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও অনেক অবদান রয়েছে।

অতি চালাকের গলায় দড়ি

এক দেশে ছিল বিরাট এক জঙ্গল। সে জঙ্গলে বাস করতো হিংস্র ও ভয়ঙ্কর এক বাঘ। হরিণের রক্ত ও গোশতই ছিল তার প্রিয় খাবার। প্রতিদিন দু'টি হরিণের ঘাড় মটকে তাজা রক্ত ও গোশত খেতে না পারলে তার ঘুমই হতো না।

প্রতিদিন দু'টি করে হরিণ খাওয়ার ফলে এক সময় জঙ্গলটা হরিণশূন্য হয়ে গেল। শেষ হলো বাঘের প্রিয় খাবার আর শুরু হলো তার ক্ষুধার কষ্ট। অসহ্য ক্ষুধার কষ্ট সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে বাঘ নানান অরুচিকর খাবার খেতে শুরু করলো। অরুচিকর খাবারের ফাঁকে একদিন বাঘ একটা ভেড়া শিকার করে খেয়েছিল। ভেড়ার রক্ত ও গোশত তার কাছে ভালো লাগলো। তাই হরিণের বদলে প্রতিদিন দু'টি করে ভেড়া খাওয়ার ফন্দি করতে লাগলো।

জঙ্গলের দক্ষিণ পাশে সবুজ ঘাসে ভরা বিশাল মাঠ। সে মাঠে প্রতিদিন হাজার হাজার ভেড়া দল বেঁধে ঘাস খেতে আসে। ভেড়ার পাল দেখে বাঘের জিহ্বা লোভে টলমল করে। কিন্তু ভেড়ার পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার ধরার সাহস পায় না বাঘ। কারণ, ভেড়ার পালের সঙ্গে সব সময় আঠার মতো লেগে থাকে লাঠিয়াল ভেড়াপালক। শিকার ধরতে চাইলে ভেড়াপালক তার মোটা লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে বাঘকে মেরে ফেলবে। এটাই বাঘের আসল ভয়। কিন্তু ভয় পেলে যে না খেয়ে মরতে হবে–বাঘ তা টের পেয়েছে। তাই সে ছদ্মবেশ ধরার সিদ্ধান্ত নিল। গত পরশু বাঘ যে ভেড়াটা খেয়েছিল, সেই চামড়াটা এনে বাঘের গায়ে জড়ালো। বাঘ এবার নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারছে না। নিজেকে

হুবহু ভেড়ার মতো দেখে দুষ্টুমির হাসি হাসতে লাগলো। তারপর ছদ্মবেশী বাঘ সুযোগ বুঝে ভেড়ার পালের ভেতর ঢুকে পড়লো।

এবার বাঘের মনে আনন্দ উথলে উঠেছে। ভেড়াদের শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে হাঁটছে সে। ভেড়াদের শরীরের সুস্বাদু ও মজাদার গন্ধে সারা মাঠ মৌ মৌ করছে। ছদ্মবেশী বাঘ ভেড়ার পালের সঙ্গে মিশে সারা মাঠ ঘুরছে। প্রাণের ভয়ে মাঝে মাঝে ভেড়াদের মতো মাথা নিচু করে ঘাসও খাচ্ছে। কারণ, ঘাস না খেলে আর মাথা উঁচু রাখলে ভেড়াপালক মনে করবে, ভেড়াটার অসুখ হয়েছে। কোথায় কী হয়েছে জানার জন্য উল্টেপাল্টে দেখবে। ভালো করে দেখলেই সে ধরা পড়ে যাবে।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভেড়াপালক পাল নিয়ে বাড়ি ফিরলো। ভেড়াগুলো খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

এদিকে ছদ্মবেশী বাঘ ভেড়া খাওয়ার লোভে মনে মনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠলো। ভেড়াপালক ঘুমুতে গেল আর ছদ্মবেশী বাঘ শিকার ধরতে তৈরি হলো। এমন সময় ভেড়াপালকের শ্বশুরবাড়ি থেকে ক'জন মেহমান এলো। ভেড়াপালক মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য একটা বড় ভেড়া জবাই করার সিদ্ধান্ত নিল। ঝটপট ঘর থেকে ধারালো লম্বা ছুরিটা এনে ভেড়ার ঘরে ঢুকলো। সবচে উঁচু ও বড় একটা ভেড়া ধরে জোর করে বাইরে নিয়ে এলো। তারপর মহল্লার ইমাম সাহেবকে খবর দিল।

এবার ভেড়াপালক ও তার ছেলে দু'জন মিলে ভেড়াটাকে শোয়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু শক্তিশালী ভেড়া শুইতে চায় না। তাই ইমাম সাহেব ভেড়াটা শুয়ানোর জন্য আরো তিনজন যুবককে ডাকলেন। পাঁচজন মিলে মাটিতে শুইয়ে ভেড়ার গলায় ছুরি বসালেন।

জবাই করা ভেড়া নিয়ে ভেড়াপালক ঘরে ফিরলো এবং ভেড়ার গা থেকে লোম ছাড়ানো শুরু করলো। লোমগুলো অত্যন্ত নরম। লোম ছাড়ানো শেষ হতেই ভেড়াপালক ভয়ে ও বিস্ময়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কারণ, নরম লোমের ভেতরে যে এক ভয়ঙ্কর বাঘ।

শেষে বাঘটিকে তারা মাটিচাপা দিয়ে অন্য একটি ভেড়া জবাই করে মেহমান সামাল দিল। বাঘ ছদ্মবেশ ধরার জন্য উচিত সাজা পেল।

শিক্ষা : কথায়ই আছে– অতি চালাকের গলায় দড়ি।

অনৈক্যের পরিণাম

গল্পটি বলেন আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত মনীষী ইমাম আনওয়ার আওলাকি। এক জঙ্গলে চারটি গরু আর একটি সিংহ বাস করতো। মোটামুটি ভালোভাবেই দিন কাটছিল গরুগুলোর। কিন্তু প্রতিদিন একটা চ্যালেঞ্জ পার করে দিন কাটাতে হয় তাদের। সেটি হলো একতাবদ্ধ হয়ে সিংহের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা। সিংহটি বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে। কিন্তু একটি গরুকে আক্রমণ করলে অন্য গরুগুলো সিং বাড়িয়ে ছুটে আসে। তাই সিংহ আর আক্রমণের সাহস পায় না। এবার সিংহ একটা ফন্দি আঁটলো, যে করেই হোক ওদের ঐক্য ভাঙতে হবে।

পরিকল্পনা মতে পরের দিন গরুগুলোর কাছে গিয়ে বললো, তোমরা প্রতিদিন রাতে যখন গভীর জঙ্গলে লুকাও, তখন আমি তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে পারি শুধু একটা কারণে। আর সেটা হলো তোমাদের মধ্যে ঐ যে সাদা রঙের গরুটা রয়েছে, ওর কারণে। ওর গায়ের রঙ সাদা হওয়ার কারণে আমি রাতের বেলায়ও তোমাদের সন্ধান পেয়ে যাই।
পরের দিন সাদা গরুকে বাদ দিয়ে তিনটি কালো গরু একসঙ্গে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাদা গরুটাকে দল থেকে বের করে দিল। আর সিংহ গরুটাকে একা পেয়ে খেয়ে ফেললো। কালো গরুগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো আর মনে মনে খুশি হলো। তারা ভাবলো, যাক সমস্যা সৃষ্টিকারীটা শেষ হয়ে ভালোই হয়েছে।

কিছুদিন পর সিংহ আবার আক্রমণ শুরু করলো, তার পরের টার্গেট বাকি তিনটা গরুর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল গরুটা। ফন্দিমতো একদিন আক্রমণ করে বসলো। আগে চারটা গুরু থাকার কারণে চারদিক থেকে আক্রমণ প্রতিহত করা যেত। এখন বাকি গরু দুইটাকে অনেক রিস্ক নিয়েই আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়। এভাবে সিংহ শুধু দুর্বল গরুকেই প্রতিদিন আক্রমণ করতে থাকলো।
দশদিন পর সিংহ ফন্দিমতো গরুগুলোর কাছে গিয়ে বললো– দেখো, তোমাদের মধ্যে বড় ও শক্তিশালী গরু দুইটাকে আক্রমণ করার শক্তি

আমার নেই, তবে আমি যতদিন আছি এই দুর্বল গুরুটাকে প্রতিদিন আক্রমণ করবো। ওর জন্য তোমরা প্রতিদিন কষ্ট করছো কেন?
এরপর শক্তিশালী গরু দুইটা পরামর্শ করে বললো, সিংহতো ঠিকই বলেছে, শুধু একজনকেই প্রতিদিন আক্রমণ করে, তাহলে ওর জন্য আমরা প্রতিদিন কষ্ট করতে যাব কেন?
তারা দুর্বল গরুটাকে একঘরে করে আলাদা করে দিল। সিংহ দেখলো, তার ফন্দিতে কাজ হয়েছে। সুযোগ পেয়ে খেয়ে ফেললো দুর্বল গরুটাকে। রইলো বাকি দুই। এখন একজনকে আক্রমণ করলে প্রতিহত করবে মাত্র একজন। তাই পরের দিন সিংহ যখন আক্রমন করলো, বাকি গরুটা এতো সাহস পেল না বরং অপর গরুটাকে একা ফেলে দৌড়ে পালালো।

তৃতীয় গরুটাও সিংহ খেয়ে ফেললো। রইলো বাকি মাত্র একটা। অতি চালাক গরুটা। অতি চালাকের গলায় দড়ি। আর গরুর গলায় তো দড়ি থাকেই। সপ্তাহখানেক পর সিংহের যখন ক্ষুধা লাগলো, আবার শুরু করলো তার মিশন। আক্রমণ করে বসলো বাকি একমাত্র গরুটাকে। গরুটা কোনোমতে ছুটে গিয়ে দৌড়াতে লাগলো। অবশেষে আর পারে না, দুর্বল হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পড়লো একটি খাদে।
সিংহ যখন গরুটার একদম কাছে এগিয়ে গেল, মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে গরুটার দুই চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো। তখন সে বললো, আমার মৃত্যু আজকে হচ্ছে না, আমার মৃত্যু সে দিনই হয়ে গেছে যেদিন সাদা গরুটা আমার সামনে ছিঁড়েফেঁড়ে খেয়েছিলে আর আমি প্রতিরোধ না করে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছিলাম...।
তখন সিংহটি বিদ্রুপ করে বললো, বুঝেছো কিন্তু একটু দেরি করে বুঝেছো। আজকে শুধু আফসোস করা ছাড়া আর কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। নিমেষেই সিংহটি তার শেষ শিকারটা পেটে চালান করে দিল।

শিক্ষা : ইহুদি-খ্রিস্টানরাও বিভিন্ন ছলচাতুরির মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করে রাখছে। আর এই দুর্বলতার সুযোগে ইসলাম ও মুসলমানদের নানান ক্ষতি করে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মুসলমানদের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। একতাই শক্তি।

সিংহ, শুয়োর ও শকুনি

এক বনে একটি সিংহ বাস করতো। সেই বনে অন্য প্রাণীরাও সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। এক সময় গ্রীষ্মকাল এলো। প্রচণ্ড গরম পড়লো। চারদিকে কোথাও পানি নেই। জঙ্গলের গাছপালা সব শুকিয়ে যেতে লাগলো। কোথাও কোথাও মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। চারদিকে গরম হাওয়া বইছিল।

বনের প্রাণীরা পানির খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জঙ্গল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ছোট্ট ঝরণা ছিল। একটি শুয়োর একদিন সেই ঝরণার খোঁজ পেল। এরপর তৃষ্ণার্ত শুয়োরটি মহা আনন্দে সেই ছোট্ট ঝরণার দিকে এগুতে লাগলো। যেই না ঝরণার পানিতে সে মুখ দিতে গেল, হঠাৎই সে লক্ষ্য করলো ঝরণার পানি যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বিপরীত দিক থেকে একটি সিংহ এই ঝরণাতেই পানি খেতে আসছে। ধীরে ধীরে সে আরো কাছে এলো। সিংহের খুব রাগ হলো। সে হলো বনের রাজা। তার আগে শুয়োরটা পানি খাবে! কিছুতেই না। তাকে সে কিছুতেই এই ঝরণার পানি খেতে দেবে না। তাছাড়া বনের রাজা সে। রাজার সঙ্গে একই ঘাটে কেউ পানি খেতে পারে না।

পানি খাওয়া নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে নিয়মমতো লড়াই বেঁধে গেল। সে এক মারাত্মক লড়াই। অনেকক্ষণ ধরে সে লড়াই চললো। কেউ কাউকে হারাতে পারছিল না। তবে লড়াই করতে করতে দু'জনই হাফিয়ে পড়েছিল। তাই একটু হাঁফ ছেড়ে নিতে গিয়ে উভয়েই লক্ষ্য করলো যে, কোন ফাঁকে এক শকুনি তাদের থেকে একটু দূরে বসে অপেক্ষা করছে। কে আগে মরে। মরলেই তার গোশত খাবে। তা দেখে সিংহ আর শুয়োর একটু থমকে গেল। শকুনির পেটে যাওয়ার চেয়ে ঝগড়া বন্ধ করাই ভালো। ঝগড়া করে আমাদের তেমন কোনো লাভ হবে না। মাঝখান থেকে শকুনির লাভ হবে। তারা একটু থেমে কী যেন ভাবতে লাগলো। শকুনিকে দেখে ওদের দু'জনেরই মনে শুভবুদ্ধির উদয় হলো। সিংহ শুয়োরকে প্রস্তাব দিল– ভাই, আমরা আর ঝগড়া বিবাদ করবো না। মারামারি করে আমাদের মধ্যে যে

কেউ মরলে ঐ শকুনিরই লাভ হবে। সে তখন আমাদের মজা করে ঠুকরে ঠুকরে খাবে। সেটি আমরা হতে দেব না। তার চেয়ে ভাই এসো আমরা বিবাদ মিটিয়ে নেই। তুমি তো আগে ঝরণার পানি খেতে এসেছো, তাই তুমি আগে পানি পান করো। আমি পরে এসেছি, তাই পরে করবো।
শুয়োরটি সিংহকে বললো, আপনি রাজার মতোই আচরণ করলেন। তাই আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। আপনি বনের রাজা। রাজাকে সম্মান জানাতে হয়। তাই আমার অনুরোধ, রাজা হিসেবে আপনি প্রথম পানি পান করুন, তারপর আমি আপনার বরকত গ্রহণ করবো।
শুয়োরটি বনের রাজাকে যখন এভাবে বলছিল তখন শকুনি সব শুনে ভাবলো, এখানে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, আজ তার কপাল মন্দ। এই ভেবে শকুনি আকাশের বুকে তার বিশাল পাখা মেললো।

শিক্ষা : নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে শত্রুপক্ষের লাভ হয়, আর নিজেদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই হয় না।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে

এক জায়গায় একদল ইঁদুর বাস করতো। আর সেখানে থাকতো একটি হুলো বিড়াল। বিড়ালের অত্যাচারে ইঁদুরেরা এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একটা উপায় না করলে এবার বুঝি তাদের বংশে নির্মূল হতে হবে। এখন কী করা যায় তাই ঠিক করতে এক সভা বসলো ইঁদুরদের। সে সভায় উপায় বাতলাতে যার যা মনে এলো সে তাই বলে গেল, কিন্তু কারো প্রস্তাবই তেমন মনের মতো হলো না। শেষ পর্যন্ত একটা বিজ্ঞ ইঁদুর বললো, আমি বলি কি– ঐ বিড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হোক, তাহলে ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই আমরা সাবধান হয়ে যাব।
সর্বসম্মতিতে এই প্রস্তাবে সব ইঁদুরই রাজি হয়ে গেল।
এতক্ষণ এক বৃদ্ধ ইঁদুর চুপ করে বসে বসে সব শুনছিল। কিন্তু এবার আর সে চুপ থাকতে পারলো না। বৃদ্ধ ইঁদুরটি বললো, আমার প্রবীণ বিজ্ঞ বন্ধু

যা বললেন, সেটা খুবই বুদ্ধির কথা বটে। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিতে পারলে আমাদের আর কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ ঘণ্টাটা বিড়ালের গলায় বাঁধতে যাবে কে?
বৃদ্ধ ইঁদুরটির কথা শুনে ইঁদুররা আর কোনো উত্তর দিতে পারলো না। শুধু পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে লেজ নাড়াতে লাগলো।

শিক্ষা : পরামর্শ দেওয়া সহজ কিন্তু বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন।

শিয়াল ও কাকের ফেসবুক

একটি কাক এক টুকরা গোশত চুরি করে একটি উঁচু গাছের ডালে গিয়ে বসলো। গোশতের টুকরাটা তার দু'ঠোঁটের মাঝখানে ধরা। তখন একটি শিয়াল তাকে দেখতে পেয়ে এক দুষ্ট ফন্দি আঁটলো। তার উদ্দেশ্য হলো, ঐ গোশতের টুকরাটা হাতিয়ে নেওয়া।
শিয়াল কাককে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, বাহ! কী সুন্দর তোমার চেহারা, খাড়া ঠোঁট, চকচকে কালো গায়ের রঙ। ব্ল্যাক ডায়মন্ড বললেও ভুল হবে না। কিন্তু আফসোস, ফেসবুকে তোমার কোনো একাউন্ট নেই। থাকলে আমার মতো তুমিও সেলফি তুলে আপলোড দিতে পারতে। কিন্তু কী আর করবে, তোমার তো আর স্মার্টফোন নেই যে সেলফি তুলে আমার মতো আপলোড দিবে! এক কাজ করতে পারো। নিচে এসো। আমার সেট দিয়ে দুইজনে মিলে একটা সেলফি তুলে আমার আইডিতে শেয়ার করে দিচ্ছি। এরপর তোমাকে একটা আইডি খুলে দিচ্ছি। দেখবে চোখের পলকেই তোমার হাজার হাজার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট চলে আসবে। আর চাইলে তুমি মাঝে মাঝে এসে আমার সেট থেকেই নোটিফিকেশন চেক করতে পারবে। স্ট্যাটাসও দিতে পারবে। আমি মাইন্ড করবো না।
এতোক্ষণ ধরে কাক শিয়ালের কথা শুনে রাগে ফোস ফোস করছিল। কোথাকার কোন শিয়ালের এতো বড় সাহস, আমাকে এইভাবে অপমান করে! কাক তার পকেট থেকে তার নকিয়া লুমিয়া ৭২০ সেটখানা বের

করে শিয়ালকে দেখিয়ে বললো, ওরে বেক্কল শিয়াল, এই যুগে কি কারো কাছে স্মার্টফোন না থাকে! এই দেখ আমিও স্মার্টফোন চালাই। আর আমিও সেই ২০০৮ থাইক্কা ফেসবুক ইউজাই। আমার ফলোয়ারের সংখ্যা কত জানো চান্দু! ৫০ হাজার! আর তুমি আইছো আমারে ফেসবুক শিখাইতে!

শিয়ালকে কথাগুলো শোনাতে পেরে কাক খুব মজা পেল। কিন্তু কখন যে তার ঠোঁট থেকে গোশতের টুকরাটা নিচে পড়ে গেছে সেটা সে খেয়ালই করেনি। শিয়াল গোশতের টুকরাটা নিজের হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে বললো, ওরে বোকা কাক, তোর স্মার্টফোন থাকতে পারে, ফেসবুকে হাজার ফলোয়ারও থাকতে পারে, কিন্তু তুই নিজে একটুও স্মার্ট না। একটা হাদারাম মাত্র। হা হা হা!

বলেই শিয়াল গোশতের টুকরা মুখে নিয়ে বনের ভেতরে চলে গেল। আর কাক 'হা' করে তাকিয়ে রইলো।

শিক্ষা : সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, যেন খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়ে নিজের প্রিয় জিনিস হারিয়ে না যায়।

শিয়াল ও কুকুরের বন্ধুত্ব

শিয়াল পণ্ডিত বেশ চিন্তিত। কারণ, তার প্রিয় খাবার মুরগি খেতে পারছে না। মুরগির মালিক কিছুদিন ধরে কুকুর পালছে। শিয়াল-কুকুরের শত্রুতা দীর্ঘদিনের। শিয়াল যখনই মুরগির খোপের কাছে যায়, অমনি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তার দিকে তেড়ে আসে। এতে মালিক জেগে ওঠে। তখন শিয়াল ভয়ে পালিয়ে যায়। শিয়াল ভাবলো– না, এভাবে হবে না। অন্য পথ বের করতে হবে।

একদিন শিয়াল দূর থেকে দেখলো, মালিক কুকুরটাকে পেটাচ্ছে। শিয়াল ভাবলো, এটাই ঝোঁপ বুঝে কোপ মারার সুযোগ। এর আগে শিয়াল কখনো কুকুরের সামনে যাওয়ার সাহস পায়নি। আজ প্রথম কুকুরের কাছে

গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বললো– ভাই, তুমি কাঁদছো। তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। ক্ষুধার জ্বালায় তুমি ভাতের পাতিলে মুখ দিয়েছো, তাই বলে বেদম প্রহার করতে হবে? সারারাত বাড়ি পাহারা দেওয়া ছাড়াও তুমি তার কত উপকার কর। আর মালিক তোমাকে এভাবে কষ্ট দেয়। তুমি আমার সঙ্গে চলো। দু'জনে জমি চাষ করে জীবন ধারণ করবো। তবু অসভ্য মানুষের কাছে আর নয়।

শিয়াল কুকুরকে ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝালো, তুমি আমাকে শত্রু ভেবো না। আমি অতীতের সব পাপ থেকে তওবা করেছি। আজ থেকে আমরা দু'জন বন্ধু। আরো অনেক কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলে কুকুরকে সেখান থেকে নিয়ে এলো।

কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে শিয়াল আলু চাষ করলো। ফল তোলার সময় হলে শিয়াল কুকুরকে বললো, বন্ধু! তুমি মাটির নিচেরগুলো নিবে নাকি উপরেরগুলো?

কুকুর বললো, ভাই! আমি তো কোনোদিন এসব করিনি। তুমি বলো, কোন ভাগ দিবে?

শিয়াল বললো, মাটির নিচেরগুলো আমি নিই। কারণ, অনেক কষ্ট করে এগুলো পরিষ্কার করতে হবে। এতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু উপরেরগুলো তুলতে তেমন কষ্ট নেই। তাই তুমি উপরেরগুলো নাও।

কুকুব সরল মনে শিয়ালের প্রস্তাব মেনে নিল এবং তার প্রতি শিয়ালের দয়া দেখে খুশি হলো।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই কুকুরের খাবার পচতে লাগলো। এক সময় তার সব পচে গেল। আর শিয়াল দিনে আলু এবং রাতে মুরগি খেতে থাকলো। এতে কুকুর খুব কষ্ট পেল।

কয়েকদিন ধরে কুকুরের খাবার নেই। ক্ষুধার জ্বালাও সহ্য করতে পারছে না। বাধ্য হয়ে শিয়াল থেকে কিছু সাহায্য চাইলো।

শিয়াল বললো, তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই। তবে বন্ধু হিসেবে আমি তোমাকে সামান্য কিছু দিয়ে সাহায্য করতে পারি।

কুকুর এতেই রাজি হলো।

কিছুদিন পর শিয়াল বললো, চলো আবার কিছু চাষ করি।

কুকুর বললো, এবার কিন্তু নিচেরগুলো আমার।

শিয়াল বললো, ঠিক আছে। এরপর শিয়াল বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, এবার আনারস চাষ করবো। কারণ, আনারসে প্রচুর ভিটামিন আছে। আনারস খেলে তুমি মোটাতাজা হবে। এসব বলে বুঝিয়ে আনারস চাষ করলো।
আনারস বড় হলে পূর্বের শর্তানুযায়ী কুকুরকে নিচের অংশ দিয়ে মূল আনারস নিল শিয়াল। এভাবে আবারো ধোঁকা দিল কুকুরকে। বোকা কুকুর উপরের ধারালো অংশ খেতে না পেরে ফেলে দিল।
এরপর কুকুর অনাহারে থাকতে লাগলো। তখন সে শিয়ালের কাছে কিছু খাবার চাইলো। শিয়াল কুকুরকে সামান্য কিছু আনারস দিয়ে গর্ব করে বললো, দেখো আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। তোমার অংশ তোমাকে পুরোটাই দেওয়ার পর আবার আমার অংশ থেকেও দিচ্ছি।
এরপর শিয়াল কুকুরকে বললো, চলো এবার পাকা তাল খেয়ে আসি। পেটে ক্ষুধা থাকায় কুকুরকে তালগাছে উঠতে বললো। কিন্তু দুর্বলতার কারণে কুকুর উঠতে পারলো না। তখন শিয়াল বললো, ঠিক আছে আমিই গাছে উঠছি, তুমি গাছের নিচে থাকো।
এরপর দুষ্ট শিয়াল তাল পেরে কুকুরের ঠিক মাথা বরাবর ফেললো। অমনি মাথা ফেটে কুকুরটি অচেতন হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে রইলো। শিয়াল নিচে নেমে তাল নিয়ে গীত গাইতে গাইতে চলে গেল।
সেই রাস্তা দিয়ে কুকুরের মালিক যাচ্ছিল। কুকুরের এ দুরবস্থা দেখে সে খুবই মর্মাহত হলো। এরপর চিকিৎসা ও খাবার দিয়ে কুকুরকে সুস্থ করে তুললো। এরপর কুকুরের কাছে তার করুণ পরিণতির কথা জানতে চাইলো। কুকুর কেঁদে কেঁদে সব কথা মালিককে জানালো।
তখন মালিক স্নেহের সুরে বললো, শত্রু কি কখনো বন্ধু হয়? শত্রু শত্রুই থাকে। তুমি আর কখনোই শিয়ালের কথা শুনবে না, ঠিক আছে?
কুকুর আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, কথা বলতে পারলো না। শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, জি।
সেদিন থেকে কুকুরের আর খাওয়ার কষ্ট রইলো না। ওদিকে মালিকের মুরগিও খোয়া গেল না। তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকলো।

শিক্ষা : শত্রু যত মিষ্টি কথাই বলুক, কখনো বন্ধু হতে পারে না। তাই শত্রুর মিষ্টি কথায় কান দিতে নেই।

যথার্থ প্রতিশোধ

একবার এক ঈগল পাখির সঙ্গে হঠাৎ এক শিয়ালীর দেখা হলো। প্রথম দেখায়ই দু'জন দু'জনকে ভালো লেগে গেল। তাই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বন্ধুত্বটা যেন সব সময় বজায় থাকে এবং আরো মজবুত হয় সে জন্য তারা দু'জন কাছাকাছি বসবাস করবে ঠিক করলো। বিরাট একটা গাছের মাথায় ঈগল বাসা বানিয়ে সেখানেই তার ডিম পাড়লো, আর শিয়ালী ঐ গাছের নিচেই তার আস্তানা তৈরি করলো এবং এক সময় সেখানেই তার বাচ্চা হলো।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। শিয়ালী একদিন খাবারের খোঁজে বাইরে গিয়েছিল, আর ঈগলের তখন বড্ড ক্ষুধা পেয়ে বসলো। কোথায় আর যাবে সে খাবারের খোঁজে? শিয়ালী যখন বাসায় নেই তখন সে তার বাচ্চাগুলোই নিয়ে এলো তার বাসায়, তারপর নিজের বাচ্চাদের নিয়ে সেগুলো বেশ মজা করে খেলো।

যথাসময়ে শিয়ালী বাসায় ফিরে এলো। এসে দেখে তার বাচ্চাগুলো নেই। বুঝতে আর বাকি রইলো না তার, ঈগলই যে তার বাচ্চাদের মেরে খেয়েছে। বাচ্চা হারানোর শোকের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠলো তার প্রতিশোধ স্পৃহা, ভাবতে লাগলো ঈগলের এই মন্দ কর্মের ও বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি কিভাবে দেওয়া যায়।

শিয়ালী মাটির প্রাণী, মাটিতেই তার চলাফেরা, মাটি ছেড়ে উঠতে পারে না, উড়তে পারে না, একটা পাখিকে সে শায়েস্তা করবে কিভাবে? সবলের অত্যাচারে দুর্বল যখন আর কিছুই করতে পারে না, তখন তাকে শুধু অভিশাপ দিয়েই মনের জ্বালা মেটাতে হয়। শিয়ালীও তাই করতে লাগলো। কিন্তু শিয়ালীকে বেশিদিন দুশ্চিন্তা করে অপেক্ষা করতে হলো না।

কয়েকদিন পর সামনের একটা ক্ষেতে কয়েকজন হিন্দুলোক পাঁঠা বলি দিয়ে যজ্ঞ করতে এসেছিল। পাঠার গোশত রান্না করতে তারা কাঠ খড় দিয়ে আগুন জ্বেলেছিল, আগুনের ফুলকি এদিক ওদিকে ছিটকে পড়ছিল। ঈগল ভালো করে না দেখে ওরই একটা টকটকে জ্বলন্ত টুকরো ছোঁ মেরে তার বাসায় নিয়ে এলো। তখনই দমকা হাওয়া বয়ে গেল। ফলে টুকরোর

এক পাশের আগুনে ঈগলের বাসার খড়কুটো সব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এতে ঈগলের বাচ্চাগুলো পুড়ে মারা গেল এবং আধপোড়া বাচ্চাগুলোসহ জ্বলন্ত বাসাটা খসে পড়লো নিচে। শিয়ালী তাই দেখে ছুটে গিয়ে শত্রু ঈগলের আধপোড়া বাচ্চাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। সে যেন রাজধানীর বাসমতি হোটেলের গ্রিলের স্বাদ পেল।

শিক্ষা : যেমন কর্ম তেমন ফল।

ফর্সা হওয়ার স্বপ্ন

একটি জলাশয়ে থাকে একটি রাজহাঁস। তার পাশেই গাছের উপর থাকে একটি কাক। একদিন কাক আর রাজহাঁসের মধ্যে কথা হচ্ছিল। কাক রাজহাঁসকে অনেক দুঃখ করে বললো, তুমি দেখতে কী সুন্দর। আমিও যদি তোমার মতো সাদা হতে পারতাম! আমার গায়ের রং কালো, তাই কি বিচ্ছিরিই না দেখতে আমি।

কাক বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছিল, হয়তো রাজহাঁস পানিতে থাকে বলেই তার গায়ের সব ময়লা ধুয়ে ফর্সা হয়ে গেছে। আমিও যদি পানিতে থাকতে শুরু করি, তাহলে আমার গায়ের রঙও ফর্সা হয়ে যাবে।

এমন ভাবনার পর কাকটি পানিতে নেমে পড়লো। পানিতে নেমে রাজহাঁসের মতো আচরণ করতে শুরু করলো। সে কয়েকবার ডুব দিয়ে পাড়ে উঠে এলো। কিন্তু নিজের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে আগের মতোই কালো রয়ে গেছে।

এরপর কাকের মনে হলো, শুধু পানিতে নামলেই হবে না, ঐ পানিতেই তাকে থাকতে হবে। এই ভেবে সে দিন-রাত পানিতেই থাকতে লাগলো। কাক যত দিন ডাঙায় ছিল এখানে সেখানে উড়ে গিয়ে কিছু না কিছু খাবার জোগাড় করতে পারতো, কিন্তু পানিতে তো কাকের খাবার পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষিধে পাওয়ার পরও কাক জেদ করে পানি ছেড়ে উঠলো না। এদিকে না খেয়ে খেয়ে সে ধীরে ধীরে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যেতে লাগলো। এমন

করে পানিতে থেকে থেকে কাক সাদা তো হলোই না, তার উপর না খেয়ে খেয়ে একদিন সে মরেই গেল। পানিতেই মিশে গেল তার ফর্সা হওয়ার স্বপ্ন।

শিক্ষা : অসম্ভব স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নতো পূরণ হয়ই না, উল্টো নিজের যা আছে তাও হারাতে হয়।

ছোট'র কাছেই পরাজয়

ডাঁশ হলো মশা জাতীয় একটি ক্ষুদ্র পোকা, হুল ফুটিয়ে অবস্থা কাহিল করে ফেলে। ও পশুদের ওপরই বেশি আক্রমণ চালায়। তো এক ডাঁশ একটি সিংহের কাছে এসে বললো, শোন রে সিংহ, আমি তোকে একটুও ভয় পাই না, আর তুই আমার থেকে কিছুতেই শক্তিশালী নোস। তোর জোরটাই বা কিসে? আঁচড়াতে পারিস নোখ দিয়ে, কামড়াতে পারিস দাঁত দিয়ে, এমন কী এলো গেল তাতে? আবারও বলছি শুনে রাখ, সব দিক ভেবে দেখলে আমার জোর তোর থেকে অনেক বেশি। কোনো সন্দেহ থাকলে আয়, লড়ে যা, দেখি কে জিতে কে হারে।

এরপর ডাঁশ ভোঁ ভোঁ শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সিংহের উপর, আর একেবারে তার নাকের ডগায় দিল হুল ফুটিয়ে। সিংহ ডাঁশটাকে থাবা দিয়ে মারতে গিয়ে নিজেরই নখে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে ভীষণ রকম কাহিল হয়ে পড়লো। ডাঁশ এইভাবে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ জিতে গোঁ গোঁ করে বিজয়-সঙ্গীত গাইতে গাইতে উড়ে চলে গেল। কিন্তু বেশিদূর যাওয়া হলো না তার, সোজা গিয়ে জড়িয়ে গেল কাছাকাছি এক মাকড়সার জালে। একটু পরে চলে গেল মাকড়সার পেটে। মরার সময় ডাঁশটা খুব করে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে বলে গেল, কী দুঃখের কথা, আমি সিংহের মতো একটা শক্তিশালী প্রাণীকে এতো সহজে হারিয়ে দিলাম, আর এখন একটা তুচ্ছ মাকড়সার কাছে শেষ হয়ে যাচ্ছি...।

শিক্ষা : বড় বলে অহংকার করতে নেই। সময়ে নিজের চেয়ে ছোট'র কাছেও হার মানতে হয়।

ইঁদুর ও সিংহের উপকার

একটি সিংহ পাহাড়ের গুহায় ঘুমিয়ে ছিল। তখন একটি ইঁদুর সিংহের শরীরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গর্ত ভেবে সিংহের নাকের ভেতর ঢুকে গেল। যেইনা ইঁদুর সিংহের নাকের মধ্যে গেল, অমনি সিংহ জেগে উঠলো। এতে সিংহ ইঁদুরের ওপর অনেক ক্ষেপে গেল। সিংহের নাকের ভেতর থেকে ইঁদুর বেরিয়ে এলে সিংহ তাকে হত্যা করতে চাইলো।
তখন ইঁদুর প্রাণ ভয়ে বললো– মহারাজ, আমি না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন। আপনি পশুদের রাজা। আমার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীকে হত্যা করলে আপনার কলঙ্ক লাগবে।
ইঁদুরের কথা শুনে সিংহের অনেক ভালো লাগলো। তাই মৃদু হেসে ইঁদুরটিকে ছেড়ে দিল।

কিছুদিন পর সিংহ বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। বনের মধ্যে এক জায়গায় ফাঁদ পাতা ছিল। সিংহ যেমনি ফাঁদে পা দিল অমনি সে ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়লো। অনেক চেষ্টা করেও সে ফাঁদ থেকে বের হতে পারলো না। কিছুতেই ফাঁদ থেকে বের হতে না পেরে সে উচ্চ স্বরে গর্জন করতে লাগলো।
সিংহের গর্জন সেই ইঁদুরটি শুনতে পেল। আসলে সিংহের আসা টের পেয়ে ইঁদুরটি আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে সিংহের গর্জন চিনতে পেরে খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছল। ইঁদুরটি গিয়ে দেখে, সিংহ জালে আটকা পড়ে আছে। সে বিন্দুমাত্র দেরি না করে জালের দড়ি কাটতে শুরু করলো। এভাবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ইঁদুর সিংহকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করলো। এতে ইঁদুরের প্রতি সিংহের আরো বেশি মায়া বেড়ে গেল।

শিক্ষা : কারো থেকে কখনো কোনো উপকার পেলে, পরে সময় মতো তার উপকারের প্রতিদান দিতে হয়।

মশাদের সমাবেশ

বাড়ির নামায় অগণিত মশার বিশাল সমাবেশ। মশারা সেখানে ভনভন করে উড়ে উড়ে সভা করছে। তাদের নেতা যেন এমনই জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছে আর তারা এতে সায় দিচ্ছে–

সংগ্রামী জনতা! আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই সন্তোষজনক। কোনো ভূমিকা না টেনে আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই।

সুপ্রিয় উপস্থিতি! আমরা দেখতে ছোট হতে পারি, কিন্তু বংশমর্যাদা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকে আমরা অনেক বড়। আমরা হলাম নমরুদের বিরুদ্ধে প্রেরিত খোদায়ী সেনার বংশধর। আমরা তাদের রুহানী সন্তান। এক সময় লোকজন আমাদের তেমন একটা পাত্তা দিত না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের সেই শতভাগ সাকসেসফুল অপারেশনটি বর্তমান বিশ্বের সাড়াজাগানো ওয়েব সাইট উইকিলিকস-এর মতো আলোচিত করে তোলে।

যাই হোক, বলছিলাম আমাদের পূর্বসূরিদের সেই সফল অভিযানের কথা। রাজার সঙ্গে যুদ্ধ! তাও আবার যেই সেই রাজা নয়, স্বয়ং খোদা দাবিদার নমরুদের বিরুদ্ধে। নিঃসন্দেহে এটা ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু আমাদের জাতির পিতা যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে প্রেরিত ছিলেন, তাই বিজয়টা তার সুনিশ্চিতই ছিল। হয়েছেও তাই। আল্লাহর রাস্তায় তার এই সামান্য ত্যাগটুকু দুনিয়ার বুকে আমাদের মান-মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লোকেরা যখন ইবরাহিম (আ.) ও নমরুদের আলোচনা করে, তখনই আমাদের সফল পূর্বপুরুষের সেই বীরত্বপূর্ণ রণশৈলীর কথা স্মরণ করে। এ সময় চুপে চুপে আমরা তাদের পাশে বসি। বিজয় কাহিনী শুনি। শিহরিত হই। কখনোবা প্রাণ খুলে হাসি, মন খুলে গান গাই। যদিও আমাদের আচরণে তারা বিরক্ত হয়।

বাবার মতো সুবর্ণ সুযোগ আমরা কখনো পাব কিনা জানি না। তবে আশা ছাড়িনি। কারণ, এ যুগে নমরুদ না থাকলেও তার অনেক রুহানী সন্তান

রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে পারমিশন পেলেই আমরা জানবাজি রেখে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো ইনশাআল্লাহ।
শুনেছি মশক নিধনের জন্য নতুন নতুন ফন্দি আঁটছে। আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, ষড়যন্ত্র এবং কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। আমরা উড়ে এসে জুড়ে বসিনি। আমরা এদেশের মাটিতে অতীতে ছিলাম, বর্তমানে আছি এবং ভবিষ্যতে থাকবো ইনশাআল্লাহ! মনে রাখা উচিত, আমরা নমরুদের ওপর বিজয়ী জাতি। তাই আমাদের শক্তিকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

সুপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী! আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন, আমাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য কিছু মানুষ কয়েল-স্প্রে ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তারা হয়তো জানে না, এসব তুচ্ছ জিনিস দ্বারা আমাদের দমন করা কখনো সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষের মতো আমাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমাদের মৃত্যুর হার অপেক্ষা জন্মের হার বেশি। খাদ্যের অভাবেও আমাদের প্রাণ হারাতে হয় না। যেহেতু আল্লাহই আমাদের রিজিকদাতা, তিনি আমাদের খাদ্যস্বরূপ পৃথিবীতে অসংখ্য গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি সৃষ্টি করে রেখেছেন।
তবে সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষের রক্তই আমাদের সেরা পছন্দ। তাই শত ঝুঁকি নিয়েও আমরা তাদের রক্ত আহরণ করতে চেষ্টা করি। পাপাচারীদের রক্ত চুষতে গিয়ে আমাদের যেসব ভাই প্রাণ হারায়, আমরা তাদের শহীদ বলে গণ্য করি। আমাদের কিছু ভাইকে মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের ডিস্টার্ব না করার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেন জানি তারা বিরত থাকছে না। কাফের-মুশরেকদের কাছ থেকে ওরা কোনো ঘুষ-টুষ খেয়েছে কিনা কে জানে!
সংগ্রামী জনতা! অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বর্তমানে নমরুদ স্টাইলে আইন-কানুন প্রণয়নকারীদের সাইজ করার দায়িত্ব যেসব সৈন্যের ওপর দেওয়া হয়েছিল, তারাও ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে না। এভাবে আরো কিছুদিন চলতে থাকলে আমরা নিশ্চয়ই গজবে পড়বো। পিলখানা ট্রাজেডি ও সিডর-এর ভয়াল থাবা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তা না হলে আমাদের সামনেও এরকম কঠিন সময় আসতে পারে।

তাই আমি সর্বস্তরের মশক ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করি। বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না। এখনই আমাকে ফরেস্ট হাউজে নমরুদ অপসারণ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করতে হবে। তাই এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

শিক্ষা : আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এমনকি মশা মাছিকেও না।

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর

খেজুর গাছে একটা কবুতর বাস করতো। কবুতরের যখন বাচ্চা জন্ম হতো, তখন শিয়াল এসে হাজির হতো। সে বলতো, তোমার বাচ্চাগুলো নিচে ফেল। নইলে আমি গাছে উঠবো। তাই কবুতর ভয়ে বাচ্চাগুলো নিচে ফেলতো।

একবার কবুতরের বাচ্চা হলে সে বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো। তখন তার বুদ্ধিমান বকবন্ধু তার দুঃখের কথা শুনে বললো, আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। কাল শিয়াল এলে বলবেন, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহলে গাছে উঠো।

পরদিন শিয়াল এসে বাচ্চাগুলো নিচে ফেলতে বললে কবুতর বললো, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহলে গাছে উঠো।

তখন শিয়াল ভাবলো, নিশ্চয়ই কেউনা কেউ তাকে কথাগুলো শিখিয়ে দিয়েছে। এরপর বললো, আচ্ছা তোমাকে এসব কে শিখিয়েছে?

কবুতর : বক শিখিয়েছে।

শিয়াল : সে কোথায় থাকে?

কবুতর : নদীর পাশে।

তখন শিয়াল নদীর পাশে গেল। গিয়ে বকের কাছাকাছি যেতে শুরু করলো এবং বকের সঙ্গে একরকম ভাব জমানোর চেষ্টা করলো। এক সময় সুযোগ বুঝে শিয়াল বললো– আমি নই, তুমিই বরং বুদ্ধির রাজা। তো যখন ডান দিক থেকে বাতাস বইতে থাকে, তখন তোমার মাথা কোথায় রাখ?

বক : তখন আমার মাথা বাম দিকে রাখি।

শিয়াল : যখন বাম দিক থেকে বইতে থাকে, তখন কী কর?

বক : তখন ডান দিকে রাখি।

শিয়াল : যদি সামনে পেছনে ডানে বামে সবদিক থেকে একসঙ্গে বাতাস বইতে থাকে তখন কী কর?

বক : তখন মাথা আমার পাখার ভেতরে রাখি।

শিয়াল : না, তুমি তা পার না।

বক : অবশ্যই পারি।

শিয়াল : পারলে আমাকে দেখাও দেখি, কিভাবে রাখ?

তখন বক যেই তার মাথা পাখার নিচে রাখলো, অমনি শিয়াল লাফ দিয়ে তাকে ধরে খেয়ে ফেললো।

শিক্ষা : শুধু অপরকে জ্ঞানবুদ্ধি শেখালে হয় না, নিজেও সে মতে চলতে হয়। আর সেজন্য অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন।

ক্ষমতার বড়াই

একটি বাঘ পাহাড়ের ঝরণায় পানি পান করতে গিয়ে দেখলো, কিছু দূরে নিচের দিকে একটি মেষশাবক পানি পান করছে। বাঘ মনে মনে বললো, আজ এই মেষশাবকে হত্যা করে তার কচি গোশত মজা করে খাব। কিন্তু বিনা দোষে একটা প্রাণীকে হত্যা করা উচিত নয়। তাই একটা দোষ দেখিয়ে তাকে হত্যা করতে হবে।

এমন চিন্তা-ভাবনা করে বাঘ তাড়াতাড়ি সেই মেষশাবকের কাছে গিয়ে বললো– ওরে শয়তান, তোর এতো বড় সাহস, আমি এখানে পানি খাচ্ছি দেখেও তুই পানি ঘোলা করছিস!

মেষশাবক শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, সে কি মহাশয়! আমি কিভাবে আপনার পানি ঘোলা করলাম, আমি পানি খাচ্ছিলাম নিচে, আর আপনি খাচ্ছিলেন অনেক উপরে। নিচের পানি ঘোলা হলেও উপরের পানি কখনোই ঘোলা হবে না।

বাঘ বললো– যাই হোক, তুই এক বছর আগে আমার অনেক নিন্দা করেছিলি, আজ তোকে আমি তার উচিত শিক্ষা দিব।

মেষশাবক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, মহাশয়! আপনি আমার ওপর শুধু শুধু দোষ দিচ্ছেন। আমি তো এক বছর আগে জন্মই হইনি, আমি কিভাবে আপনাকে নিন্দা করতে পারি!

বাঘ বললো– তা অবশ্য সত্য কথা, তুই না কিন্তু তোর বাপ আমার নিন্দা করেছিল। তুই করিস আর তোর বাপ করুক একই কথা। আজ আমি তোর কোনো অজুহাত শুনতে চাই না।

এই বলে বাঘ নিরীহ ও দুর্বল মেষশাবককে হত্যা করে ফেললো। এরপর তার কচি গোশত আয়েশ করে খেতে লাগলো।

শিক্ষা : জোর যার দেশ তার।

শিকারী কুকুর

এক লোকের একটি উত্তম শিকারী কুকুর ছিল। তিনি যখন শিকার করতে যেতেন, কুকুরটি সঙ্গে থাকতো। ঐ কুকুরের গায়ে অনেক শক্তি ছিল। শিকারের সময় কোনো প্রাণীকে দেখিয়ে দিলে, সে ঐ প্রাণীর ঘাড়ে এমনভাবে কামড়ে ধরতো যে, ওটা আর পালাতে পারতো না। যতদিন তার শরীরে শক্তি ছিল, সে এভাবে নিজের মালিকের উপকার করে আসছিল।

এক সময় কুকুরটির বয়স বেড়ে গেলে খুব দুর্বল হয়ে পড়লো। তার মালিক একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে গেলেন। তখন একটি শুয়োর তার সামনে থেকে দৌড়ে পালাতে লাগলো। শিকারী ব্যক্তি ইঙ্গিত করামাত্র কুকুর প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে শুয়োরের ঘাড় কামড়ে ধরলো। কিন্তু আগের মতো শক্তি ছিল না বলে শুয়োরটি ধরে রাখতে পারলো না। শুয়োর আনায়াসে ছাড়িয়ে চলে গেল।

শিকারী রাগে অন্ধ হয়ে কুকুরটিকে বকাঝকা ও মারতে শুরু করলো। তখন কুকুর বললো, মহাশয়! বিনা অপরাধে আমাকে বকাঝকা করছেন কেন, আমাকে মারছেন কেন। মনে করে দেখুন, যতদিন আমার শক্তি ছিল প্রাণ দিয়ে আপনার কত উপকার করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছি, তাই আগের মতো দৌড়াতে পারি না। এ অবস্থায় আমাকে বকাঝকা করা, তিরস্কার করা এবং আমাকে মারা আপনার জন্য মোটেও উচিত নয়।

শিক্ষা : বর্তমানে না পারলেও কারো অতীত জীবনের উপকারের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

ছোট মুখে বড় কথা

এক সময় একটি বনে এক ভালুক আর এক শিয়াল পাশাপাশি বাস করতো। দুইজনের এমন বন্ধুত্ব ছিল যে, বনের অনেকেই তাদের হিংসা করতো। দুই বন্ধু একসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নদীর তীরে এক শ্মশানের কাছে এসে হাজির হলো। আগের দিন কাছেরই কোনো গ্রামের হিন্দুরা তাদের এক আত্মীয়ের মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার করতে এসেছিল। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি আসায় মৃতদেহটি আধপোড়া অবস্থায় ফেলে রেখেই তারা চলে গিয়েছিল। শিয়াল এ মৃতদেহটা দেখে খুশি হয়ে ভালুককে বললো, আহা! আজ ঘুম থেকে উঠে যে কার মুখ দেখেছিলাম!

ওহ্ দেখেছো কী হৃষ্টপুষ্ট মানুষের দেহ, চলো চলো আমরা গিয়ে এক্ষুণি ওটা খাই।– বলতে বলতে শিয়ালের মুখ দিয়ে লালা ঝরতে লাগলো।
ভালুক শিয়ালের কথা শুনে হেসে বললো, তুমি খাবে খাও, আমি তোমার মতো নীচ নই, আমি মরা মানুষ খাওয়া তো দূরের কথা, ছুঁয়েও দেখি না।

ভালুকের মুখে এমন কথা শুনে শিয়াল বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলে উঠলো– বন্ধু, তুমি যা বললে সবই ঠিক। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, তুমি যদি জ্যান্ত মানুষ দেখলেই তাকে মেরে না ফেলতে, তাহলে আমিই জোর গলায় বলতাম, তুমি আমার চেয়েও মহৎ এবং উচ্চশ্রেণীর।

শিক্ষা : যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা বলা উচিত নয়।

বিশ্বাসঘাতক নেকড়ে

একদল চতুর নেকড়ে এক বনে বাস করতো। ঐ বনে অনেক কুকুরও থাকতো। চতুর নেকড়েরা একদিন কুকুরদের ডেকে বললো, কুকুর ভাইসব, তোমাদের একটা কথা বলি। কথাটা বলতে অনেক দিন ধরে ইচ্ছে করছে, বলি বলি করেও বলতে পারিনি। একটু মন দিয়ে শোনো। ভাইসব, মানে বলেছিলাম কি! তোমাদের আর আমাদের চেহারা তো অবিকল এক, এসো না আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে ভাই-ভাইয়ের মতো থাকি।
তোমাদের আর আমাদের মাঝে তো পার্থক্য নেই, যে পার্থক্যটুকু আছে তা হলো শুধু জীবনযাত্রার। আমরা স্বাধীন জীবন যাপন করি, আর তোমরা ক্রীতদাসের মতো মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও, তাদের পায়ে পড়ে থাকো। মানুষেরা তোমাদের গলায় শিকল পরিয়ে দিয়ে তোমাদের দিয়ে তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দেওয়ায়। তাদের খাওয়ার পর গোশতের যে হাড়গোড় পড়ে থাকে, সেগুলো তাচ্ছিল্য ভরে তোমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আর তোমরা তা চেটেপুটে মনের আনন্দে খাও। এই তো তোমাদের জীবন।
ভাইসব, মন দিয়ে শোনো– আমরা তোমাদের ভালো পরামর্শ দিচ্ছি। তোমাদের পাহারায় যে ভেড়াগুলো আছে সেগুলো আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, তারপর এসো দুই দলে সেগুলো খুব মজা করে খাই।
নেকড়েদের উপদেশে কুকুরেরা গলে গেল। তাদের উপদেশ কুকুরদের বেশ মনে ধরলো। কুকুরেরা প্রায় সব ভেড়াই নেকড়েদের হাতে ছেড়ে দিল। এরপর আর দেরি কিসের! নেকড়েরা ভেড়ার খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকেই প্রথমে শেষ করলো কুকুরগুলোকে। তারপর নিশ্চিন্তে সাবাড় করলো ভেড়াগুলোকে।

শিক্ষা : বিশ্বাসঘাতক আর কাকে বলে। দুষ্ট লোকদের মিষ্টি কথা কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

ছায়া দেখে আত্মগর্ব

দিন শেষ হতে চলেছে। পশ্চিম আকাশে ক্রমে সূর্য ঢলে পড়ছে। একটু পরেই সূর্য অস্ত যাবে। এমন সময় এক নেকড়ে নির্জন পথ ধরে যাচ্ছিল। যেতে যেতে পাশেই তার নিজের দেহের ছায়া পড়লো রাস্তার ওপর। সেই ছায়া দেখে নেকড়ে খুবই পুলকিত হলো। এ্যাঁ, আমি এতো বড়! এতো লম্বা! এ যে দেখছি প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মতো দেহ আমার। ভেবে হাসি পাচ্ছে যে, এতো জমকালো দেহ থাকতে কিনা সিংহকে আমি ভয় করে চলি! এবার থেকে আমিই হব বনের রাজা, সব পশুর রাজা! হুঁ হুঁ এবার থেকে আমিই বনের সব পশুর রাজা, পশুদের সম্রাট।

নেকড়ে যখন আত্মগর্বে মত্ত হয়ে এমন সব ভাবছিল, তখন পাশের বন থেকে হঠাৎ এক সিংহ এসে লাফিয়ে পড়লো তার ওপর। এরপর তাকে মেরে আরাম করে খেতে বসলো।

নেকড়ে তখন অনুশোচনা করে মনে মনে বললো, হায় মিছে আত্মগর্বে আমার আজ এই মরণ! হায়, হায়, আমি একি করলাম! আমার যে এমনটি করা মোটেও উচিত হয়নি।

শিক্ষা : অনর্থক অহংকার ও আত্মগর্ব এভাবেই বিপদ ডেকে আনে।

অহংকার পতনের মূল

বনের একপাশে ছিল এক বিরাট গাছ। তার শিকড় যেমন মাটির অনেক গভীরে পৌঁছেছিল, তেমনি ডালপালাও চারপাশের অনেকখানি জায়গাজুড়ে ছড়িয়েছিল। তার ঘন পাতাগুলো সূর্যের আলো প্রতিরোধ করে মানুষকে ছায়া দিত। গাছটিতে অসংখ্য পাখি বাস করতো। মানুষ ও পাখির সমাগমে গাছটির চারপাশের এলাকা মুখরিত থাকতো।
এক সময় এই বিরাট গাছের নিচে একটি গাছের চারা গজিয়ে ওঠে। এটি ছিল একটি দুর্বল হলুদ গাছ। সামান্য বাতাসেই তা নুয়ে পড়তো।
একদিন দুই প্রতিবেশী কথা বলছিল। হলুদ গাছকে লক্ষ্য করে বড় গাছটি বললো, ওহে খুদে প্রতিবেশী, তোমার শিকড়গুলো মাটির আরো গভীরে প্রবেশ করাও না কেন? কেন আমার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াও না?

হলুদ গাছটি মৃদু হেসে বললো, এর কোনো প্রয়োজন দেখি না। আসলে এভাবেই আমি নিরাপদ আছি।
বড় গাছটি বললো, নিরাপদ! তুমি কি মনে কর আমার চেয়ে নিরাপদ আছো? তুমি কি জান আমার শিকড় কত গভীরে প্রবেশ করেছে? আমার কাণ্ড কত মোটা ও শক্ত? এমনকি দু'জন লোক মিলেও আমার কাণ্ডের বেড় পাবে না। আমার শিকড় উপড়াবে আর আমাকে ধরাশায়ী করবে–এমন কে আছে?
বড় গাছটি হলুদ গাছের দিক থেকে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

একদিন সন্ধ্যায় সেই এলাকার ওপর দিয়ে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল। ঘূর্ণিঝড়ে শিকড়সহ গাছ উপড়ে পড়ে, বনের গাছপালা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। ঝড়ের পর গ্রামবাসী ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দেখতে বের হয়। আকাশচুম্বী গাছগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সেগুলো হয় উপড়ে পড়েছে অথবা ভেঙেচূরে শেষ হয়ে গেছে। সারা বনের মধ্যে যেন গাছপালার কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে শুধু একটি ব্যতিক্রম সবার নজর কাড়ে। তা হলো খুদে হলুদ গাছ। সেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল ঝাপটার শিকার হয়ে এদিক ওদিক হেলে পড়েছে কিংবা মাটিতেও লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঝড় থেমে যাওয়ার পর সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার বিরাট অহংকারী প্রতিবেশীর কোনো চিহ্নও নেই।

শিক্ষা : কখনো কখনো আকার ও শক্তি বেশি বেড়ে গেলে ভেঙে পড়তে হয়। এর সঙ্গে অহংকার থাকলে তো কথাই নেই। একথা কে না জানে– অহংকার পতনের মূল।

শহুরে ইঁদুর ও মেঠো ইঁদুর

এক গ্রামে এক মেঠো ইঁদুর বাস করতো। আর শহরে থাকতো এক শহুরে ইঁদুর। দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল। তারা মাঝে মধ্যেই একে অপরকে দাওয়াত করে খাওয়াতো। একদিন মেঠো ইঁদুরটি তার বন্ধু শহুরে ইঁদুরকে দাওয়াত করে নিয়ে এলো পাড়াগাঁয়ে তার নিজের ডেরায়। এনে শহুরে ইঁদুরকে খেতে দিচ্ছে শুধু চাল, গম আর এমনই সব দানা জাতীয় খাবার। এসব দেখে শহুরে ইঁদুরটি মেঠো ইঁদুরকে বললো, ভাই কিছু মনে করো না, তুমি আমাকে যা খেতে দিচ্ছ, এসব তো ক্ষুদে পিঁপড়েদের খাবার। তুমি আমার সঙ্গে আমার ডেরায় এসো। দেখবে কী সব ভালো ভালো জিনিস তোমায় খাওয়াই। একদিন খেলে জীবনে আর ভুলতে পারবে না।

শহুরে বন্ধুর আমন্ত্রণে রাজি হয়ে তারই সঙ্গে গ্রামের ইঁদুরটি ভালো খাবারের লোভে শহরের ইঁদুরের বাড়িতে হাজির হলো। শহুরে ইঁদুর তার মেঠো ইঁদুর বন্ধুর সামনে হাজির করলো মটরশুটি, সীমের দানা, রুটি, খেজুর, পনির, মধু আরো কত কী!

দু'জনে সেসব খাবার সবে খেতে শুরু করবে, এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরের দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। অমনি দু'জনে ভয়ে খাবার ফেলে সেখান থেকে ছুটে পালালো। একজন লুকালো খাটের নিচে, একজন সোফার নিচে।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে তারা যখন স্টোর রুমে এসে সবে শুকনো আলুতে কামড় বসাতে যাচ্ছে, হঠাৎ আবার কে যেন স্টোর রুমে এলো কী একটা দরকারে। আবার আগের মতোই তাদের খাবার ফেলে পালাতে হলো।

বার বার খেতে গিয়ে বাধা পেয়ে মেঠো ইঁদুরটি বিরক্ত হয়ে গেল। সে তার শহুরে বন্ধুকে বললো, আমি চললাম ভাই, এমন ভয়ে ভয়ে প্রাণ হাতে করে তোমার এসব ভালো ভালো খাবার খেতে আমার ইচ্ছে নেই। এর চেয়ে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে আমার মাঠের গর্তে বসে শুকনো ধান আর গমের দানা চিবুই গিয়ে। এতে আমার পেট ভরবে এবং ক্ষুধার সময় খেতে গিয়ে বারবার বাঁধা পেতে হবে না। পরাধীনতার মজার খাবারের চেয়ে স্বাধীনতার অল্প খাবার অনেক ভালো।

শিক্ষা : পরাধীনরাই ভালো বলতে পারবে– স্বাধীনতার মূল্য কেমন।

সেয়ানে সেয়ানে

একবার এক সারস পাখিকে এক ধূর্ত শিয়াল তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানালো। সারস নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলে শিয়াল দু'টি সমান পাথরের থালায় ঝোল ঢেলে দিল। একটি সারসের সামনে রাখলো এবং অপরটি নিজে নিল। শিয়াল তার নিজের থালার ঝোল জিভ দিয়ে চক চক করে

বেশ চেটেপুটে খেয়ে নিল। কিন্তু সারস বেচারা সরু লম্বা ঠোঁট দিয়ে কিছুই তুলতে পারলো না। তাই পেটে ক্ষুধা নিয়েই তাকে ফিরে যেতে হলো।
এরপর সারসও একদিন শিয়ালকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলো। শিয়াল নিমন্ত্রণ খেতে এলে তাকে সারস ঝোল পরিবেশন করলো কুঁজো বা চুঙার মতো সরু মুখবিশিষ্ট এক পাত্রে। নিজেও তেমনই একটা পাত্রে ঝোল নিল। চুঙার মধ্যে শিয়ালের মুখ ঢুকলো না। তাই সে চুঙার গা চাটতে লাগলো। সারস কিন্তু অনায়াসে চুঙার মধ্যে সরু ও লম্বা ঠোঁটটি নামিয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিল।
শিয়াল পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে বিদায় নিতে যাওয়ার সময় বললো, এটা কী হলো সারস ভাই, এটা তোমার কেমন ভদ্রতা?
সারস তাকে বললো, কিছু মনে করো না ভাই, এই ভদ্রতা আমি যে তোমার কাছেই শিখেছি। এই বিষয়ে তুমিই যে আমার গুরু।

শিক্ষা : এক মাঘে শীত যায় না।

নিজেই পড়লো ফাঁদে

কুকুর আর মোরগ বন্ধু। দু'জন মিলে ঘুরতে বের হলো। ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। তখন তারা আশ্রয়ের জন্য ঘন বনের মধ্যে চলে এলো। মোরগ চড়ে বসলো গাছের অনেক উঁচু একটা ডালে আর কুকুর সেই গাছের নিচে তার বিছানা পেতে নিল। ভোর হলে মোরগ ডেকে উঠলো কুঁককুরু কুঁক করে। সেই আওয়াজ শুনে এক শিয়াল ভাবলো, সকালের নাস্তাটা আজ মোরগের গোশতে সেরে ফেললে খাসা হয়। শিয়াল তখন সেই ডালটার নিচে চলে এলো আর নানাভাবে মোরগের মিষ্টি গলার আওয়াজের সুখ্যাতি করে তার সঙ্গে দোস্তি পাতাতে চাইলো।
শিয়াল মোরগকে বললো, আপনি রাজি থাকলে আজকের দিনটা আপনার সঙ্গে কাটাতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে।

মোরগ বললো, মশায়! আপনি এক কাজ করেন, একটু এগিয়ে এই গাছের গোড়ায় চলে যান। আমার মালপত্র যে টানে সে ওখানে ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডেকে তোলেন, সে আপনাকে এখানে আসার জন্য দরজা খুলে দেবে।
মোরগের কথায় শিয়াল গাছের গোড়ার দিকে এগুতে লাগলো। শিয়ালকে ওদিকে আসতে দেখেই কুকুর একেবারে লাফ দিয়ে উঠলো আর শিয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

শিক্ষা : অন্যকে ফাঁদে ফেলতে চাইলে নিজেই ফাঁদে পড়তে হয়।

কুকুরের মমতা

কুকুরের আবার বিড়াল দত্তক! কথাটি শুনতেই যেন কেমন লাগে। বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু বিশ্বাস হোক বা না হোক, ঘটনা কিন্তু সত্য। মানুষ ভাষায় সেটা প্রকাশ করতে পারে আর পশু-পাখি তা পারে না।
উত্তর তুরস্কে একটি কুকুর দু'টি এতিম বিড়ালকে দত্তক নেয় এবং নিজের ছানার মতো করেই তাদের আদর-যত্ন করে। এতে স্থানীয় এক পশু চিকিৎসক বিস্মিত হয়েছেন। তিনি জানান, কিছুদিন আগে কুকুরটি তাদের এলাকায় আসে। তারা কুকুরটির নাম দেন পামুক।

কুকুরটির বাচ্চা মারা যাওয়ার পর একটি মজার ঘটনা ঘটে। কুকুরটি দু'টি বিড়ালছানাকে দুধ খাওয়ানো শুরু করে। তিনি বলেন, একজন পশু চিকিৎসক হিসেবে এ ধরনের ঘটনা এর আগে কখনো আমি দেখিনি। কুকুর সাধারণত অন্য প্রাণীদের, বিশেষ করে বিড়ালদের এভাবে আদর-যত্ন করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি ভিন্ন কিছু দেখলাম। কুকুরটি খুব সহজ-সরল। এর আটটি ছানা ছিল, কিন্তু একটি ছাড়া সব মরে যায়। বেঁচে

যাওয়া বাচ্চাটিকেও আশপাশের লোকজন তুলে নিয়ে যায়। কুকুরটির একটি পা ভাঙা ছিল এবং আমিই তার যত্ন নিতাম।
নিজের ছানাটিকে লোকজন তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কুকুরটি দু'টি বিড়ালছানাকে দুধ খাওয়ানো শুরু করে। আর বিড়াল ছানাদেরও মা ছিল না। কুকুরটি ঠিকভাবে বিড়াল ছানাদের খাবার খাওয়াচ্ছিল।

শিক্ষা : সত্যিই এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। এখানে মানুষের জন্য মানবতার সবক আছে।

চালাক শিয়াল ও বোকা ছাগল

একটি শিয়াল পথ চলতে চলতে হঠাৎ পা পিছলে একটি কূপের মধ্যে পড়ে গেল। কূপ থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় ছিল না তার। ফলে শিয়াল কূপের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে নিস্তেজ হয়ে পড়লো এবং মনে মনে ভাবতে লাগলো, এই বুঝি আমার দিন শেষ, কূপ থেকে আর বেরোতে পারবো না আমি।
এমন সময় একটি ছাগল পিপাসায় কাতর হয়ে ঘুরতে ঘুরতে কূপের পাশে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কূপ থেকে পানি পান করার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই সে এক রকম নিরাশ হয়ে গেল। এরই মধ্যে হঠাৎ শিয়ালের দৃষ্টি পড়লো ছাগলের ওপর। তখন শিয়াল বললো, কিরে ভাই ছাগল! অনেক দিন হলো তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তারপর কেমন আছো তুমি?
ছাগল বললো, ভাই! আছিতো ভালো, কিন্তু আমি পিপাসায় খুব কাতর। তা তুমি এখন কেমন আছো ভাই? তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে?
শিয়াল বললো, ভাই! আমি এখানে যে শান্তিতে আছি তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তুমিও নেমে এসো। পানিও পান করতে পারবে এবং শান্তিও পাবে।
বোকা ছাগল দুষ্ট শিয়ালের কথায় কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই কূপের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মনমতো পানি পান করলো। এরপর ছাগল

দেখলো যে, বের হওয়ার কোনো পথ নেই। সে শিয়ালকে বললো, এখন বের হওয়ার উপায় কী?

দুষ্ট শিয়াল এবার তার চালাকির চাল চাললো। বললো– ভাই! বের হওয়ার পথ তো দেখছি না, তবে একটা পথ আছে। তুমি তোমার পায়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমার কাঁধে ভর করে উপরে উঠি। এরপর তোমাকে টেনেটুনে বের করবো।

বোকা ছাগল শিয়ালের কথামতো উঁচু হয়ে দাঁড়ালো। শিয়াল ছাগলের কাঁধে ভর দিয়ে কূপ থেকে বেরিয়ে এলো। এবার ছাগলের বের হওয়ার পালা। কিন্তু শিয়াল তাকে বের করার কোনো চেষ্টাই করলো না। উল্টো ছাগলকে বললো, ভাই! আমি তো বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার পক্ষে তোমাকে বের করা কোনোভাবেই সম্ভব না। আমি এখন আসি। তুমি ভাই অন্য কোনো চেষ্টা কর।

শিক্ষা : দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় দিবে নাকো কান
তাহলে যে আসবে বিপদ যাবে তোমার জান।

খরগোশের গবেষণা

বনের মধ্যে খরগোশটি তার গর্ত থেকে বেরিয়ে কম্পিউটার চালু করলো। এরপর ওয়ার্ডে টাইপ করতে লাগলো। হাঁটতে বেরিয়ে খরগোশকে দেখে পা টিপে টিপে তার কাছে এলো এক শিয়াল।

শিয়াল : [থাবা বের করে ধূর্ত হাসি দিয়ে] কী করছিস তুই?

খরগোশ : থিসিস লিখছি, আগামী পরশু জমা দিতে হবে।

শিয়াল : [তাচ্ছিল্য ভরে] ও! তো কিসের থিসিস?

খরগোশ : ওহ, আমার থিসিসের বিষয় হচ্ছে, 'খরগোশরা কিভাবে শিয়ালদের খায়!'

শিয়াল : লিখলেই হলো! ফাজলামির আর জায়গা পাস না। যেকোনো গাধাও জানে খরগোশরা কখনো শিয়াল খায় না।

খরগোশ : অবশ্যই খায়। আমি প্রমাণ দেখাচ্ছি, এসো আমার সঙ্গে ।
খরগোশ ও শিয়াল খরগোশের গুহায় ঢুকে যায়। কয়েক মিনিট পর শুধু খরগোশ ফিরে আসে, তারপর আগের মতো ওয়ার্ডে লিখতে থাকে।
একটু পর গুহার কাছে আসে একটা নেকড়ে। খরগোশের লেখা দেখে খুব কৌতূহল জাগে তার।
নেকড়ে : কী লিখছিস রে?
খরগোশ : 'খরগোশরা কিভাবে নেকড়ে খায়' তার উপর একটা থিসিস করছি।
নেকড়ে : (অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পড়তে) এ রকম রাবিশ একটা জিনিস নিশ্চয়ই পাবলিশ করার চিন্তা করছিস না তুই! নাকি চিন্তা করছিস?
খরগোশ : রাবিশ না, আমার সঙ্গে এসে দেখে যাও।
দু'জনে ঢুকে পড়ে খরগোশের গর্তে এবং আগের মতোই শুধু খরগোশ ফিরে আসে খানিক পর, মন দেয় থিসিস লেখায়।
খরগোশের গুহা। এক কোণায় দেখা যায় শিয়ালের হাড়ের স্তুপ পড়ে আছে, অন্য কোণায় নেকড়ের হাড়ের স্তুপ। আরেক কোণায় বিশালদেহী এক সিংহ বসে বসে দাঁত খিলাল করছে।

শিক্ষা : থিসিসের বিষয়বস্তু হিসেবে আপনি কী নির্ধারণ করেছেন, তা কোনো ব্যাপার নয়। তথ্য-উপাত্তের জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাও কোনো ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হলো, আপনার থিসিসের সুপারভাইজার কে।

ভিন্নবেশের পরিণতি

এক দেশে একদল বেজি বাস করতো। সেই দেশেই একদল ইঁদুরও বাস করতো। কিন্তু ওদের মধ্যে মিলমিশ ছিল না। সব সময় ওদের মধ্যে কলহ আর মারামারি লেগেই থাকতো। মারামারিতে প্রায়ই ইঁদুরের দল বেজিদের কাছে হেরে যেত। ইঁদুরের দল এই পরাজয়ের কারণ খুঁজে বের করার জন্য এক জরুরি সভা ডাকলো। সেই সভায় ছোট বড় ও অভিজ্ঞ সব

ইঁদুরই উপস্থিত ছিল। সভায় সিদ্ধান্ত হলো, তাদের দলে কোনো সরদার নেই বলেই তাদের বারবার হেরে যেতে হচ্ছে।

এই সভায়ই ইঁদুরদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে নিল। এরপর কয়েকজন তাগড়া জোয়ান ইঁদুরকে বিভিন্ন দলের সরদার নির্বাচন করা হলো। কিন্তু সব ইঁদুরই তো দেখতে একরকম! তাই দলের সরদারকে সাধারণ ইঁদুররা চিনবে কী করে?

অনেক ভেবেচিন্তে কিছু শিং বানানো হলো। আর সেই শিংগুলো লাগিয়ে দেওয়া হলো সরদারদের মাথায়।

এরপর আবার যখন বেজিদের সঙ্গে ইঁদুরদের বড় একটা লড়াই বেঁধে গেল, তখন সেই লড়াইয়েও বেজিদের তাড়া খেয়ে অনেক ইঁদুর চটপট করে তাদের গর্তে ঢুকে পড়ে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু যেসব সরদার ইঁদুরের মাথায় শিং লাগানো ছিল, তারা শিং-এর কারণে গর্তে ঢুকতে পারলো না। ফলে বেজিরা এসে তাদের অনায়াসে হত্যা করলো। সিং লাগানোর পর ইঁদুরেরা আরো বড় ধরা খেল।

শিক্ষা : স্বজাতির বেশভুষা ছেড়ে ভিন্ন বেশ ধরলে পরিণতি এমনই হয়।

নতুন অভিজ্ঞতা

মাঠের পাশে একটি খামার বাড়ি ছিল। খামার বাড়ির সামনে একটা কুকুর ঘুমাচ্ছে। এমন করে ঘুমোতে দেখে তাকে খাওয়ার জন্য পা টিপে টিপে একটি নেকড়ে এগিয়ে এলো। কুকুরটা ততক্ষণে জেগে গেছে। নেকড়েটা সবে তার গায়ে কামড় বসাতে যাবে, এমন সময় কুকুরটা এক লাফে তার থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে বললো, শোনো একটা ভালো কথা তোমাকে বলি। আমাকে এখন খেয়ে তোমার তেমন সুবিধা হবে না। আমি বড্ড রোগা হয়ে গেছি। পেটে বহুদিন ভালো-মন্দ পড়েনি। তাই আমাকে খেয়ে তোমার পেটও ভরবে না। আমার মালিকের বাড়িতে আজ মহাভোজ হবে,

আর সেই ভোজের খাবার খেয়ে একটু মোটাসোটা হয়ে নিই আমি। তারপর এসে আমাকে খেয়ো, তাতে মজা পাবে, পেটও বেশ ভরবে তোমার।
কুকুরের এই কথা শুনে নেকড়ে তাকে না খেয়ে চলে গেল।
পরদিন কুকুরের ভোজ খাওয়া হয়ে গেছে ভেবে আবার সেই নেকড়ে এলো। এসে দেখলো কুকুরটা খামার বাড়ির ছাদের ওপর নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। সে তখন কুকুরটাকে ডেকে বললো, আমি এসে গেছি, এবার তুমি নেমে এসো। আমাদের চুক্তিমতো কাজ করো।
কুকুরটা তখন হাসতে হাসতে বললো, মাটিতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে আবার কোনোদিন খেতে এলে, আমার ভোজ খাওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে যেয়ো না। তাহলে আজকের মতো না খেয়ে ফিরে যেতে হবে।

শিক্ষা : জীবনের পদে পদেই অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। আর সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলেই সফলতার মুখ দেখা যায়।

ধূর্ত শিয়াল ও মরা হাতি

এক জঙ্গলে একটা শিয়াল থাকতো, সে খুবই চালাক ছিল কিন্তু বুড়ো হয়ে যাওয়ায় বেশি কাজ করতে পারতো না। কাজ বলতে তো একটাই, শিকার করে খাবার জোগাড় করা। শিকার করতে না পারলে খাবার তো আর আপনা আপনি তার কাছে আসবে না। তাই বুড়ো হওয়ার পরও কোনো রকমে নিজেকেই খাবার জোগাড় করতে হতো। কোনো দিন খাবার জুটতো আবার কোনো দিন আধপেটা খেয়ে বা না খেয়ে থাকতে হতো। এভাবেই সেই বুড়ো শিয়ালের দিন কাটছিল।
একদিন জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়ে একটা মরা হাতি দেখতে পেল। হাতিটা মরে পড়ে আছে। সেটাকে দেখে তার খুবই আনন্দ হলো, আজকে পেটভরে খেতে পারবে। কিন্তু এক কামড় দিয়েই বুঝে গেল, হাতির চামড়া এতোই শক্ত যে, তার পক্ষে সেটা ছিঁড়ে ভেতরের নরম গোশত খাওয়া সম্ভব নয়। তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা সিংহ। সিংহ বনের রাজা। সে যদি হাতির গোশত খেতে আসে, তাহলে তাকে তোশামোদ করলে

কিছু গোশত পাওয়া যেতে পারে। এই আশায় সে সিংহের সামনে গিয়ে বললো, মহারাজকে ধন্যবাদ, আসুন এই হাতির গোশতটা খান, দেখুন এটা কেমন সুস্বাদু।

সিংহ অহংকার করে জানালো, আমি বনের রাজা, আমি মরা হাতির গোশত খাবো! হাসালে হে শিয়াল, আমি টাটকা তাজা গোশত খাই সব সময় বুঝলে...।

শিয়াল ভয়ে ভয়ে বললো, তাইতো তাইতো, এমনি এমনি কি আপনি বনের রাজা!

সিংহ খুশি হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। শিয়াল ভাবতে থাকলো, কী করি কী করি।

এবার সেই পথ ধরে একটা বাঘ আসছে, বাঘ যদি এই মরা হাতি দেখতে পায়, তাহলে পুরোটাই খেয়ে ফেলবে, একটুও তাকে দেবে না। ভেবেই সে হাতিটার পিঠের উপর চড়ে বসলো। হাতির গোশতটা তার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

বাঘ সামনে এসে শিয়ালকে দেখে জানতে চাইলো, কী করছিস এখানে? আর এই মরা হাতিটার উপর চেপে কী করছিস? সর আমি এটা এখন খাব।

শিয়াল বললো, সে তুমি খেতেই পার, আমি তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে পারবো না। তবে মহারাজ সিংহ আমাকে এটার পাহারায় রেখে গেছেন, এটা তার শিকার। এটা খেলে মহারাজকে তোমায় জবাব দিতে হবে।

সিংহের শিকারে হাত বসানো ঠিক হবে না, বনের রাজার শিকারে থাবা বসালে প্রাণটাও না থাকতে পারে। তাই এখান থেকে সরে পড়াই ভালো। এরপর বললো, ঠিক আছে ঠিক আছে, আগে বলবি তো এটা মহারাজের শিকার, তাহলে এসব কথাই উঠতো না– বলেই চুপিসারে সেখান থেকে সরে পড়লো।

একটু পর সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটা হায়েনা। সেও একইভাবে হাতির গোশত খেতে চাইলো। হাতির চামড়া শিয়াল নিজে ছিঁড়তে পারবে না, এই হায়েনাকে দিয়েই নিজের কাজ হাসিল করতে হবে। সে হায়েনাকে জানালো, এটা মহারাজ সিংহের শিকার, মহারাজ তাকে পাহারায় রেখে গেছে, এটা খেলে মহারাজ তাকে ছাড়বে না।

এ কথা শুনে হায়েনাও সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন শিয়াল ডেকে বললো– দাঁড়াও, তুমি বন্ধু মানুষ, তার উপর দেখে মনে হচ্ছে তোমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। এক কাজ করো, আমি পাহারা দিচ্ছি মহারাজ এদিকে আসছে কি না। উনি এদিকে এলেই তোমাকে জানিয়ে দেব, তুমি পালিয়ে যাবে উনি আসার আগেই।

হায়েনা এতে রাজি হলো। সে হাতির চামড়া ছিঁড়ে গোশত একটুমাত্র খেয়েছে আর তখন শিয়াল বলতে শুরু করে দিল, সিংহ আসছে পালাও পালাও।

হায়েনা সিংহের ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। এরপর শিয়াল হাতির ভেতরের নরম গোশত মনের সুখে খেতে থাকলো।

শিক্ষা : এমন ধূর্তামি করে অন্যের অধিকার ভোগ করা আর সহযোগিতা নেওয়া মারাত্মক অন্যায়।

গাছ ও কুড়ালের আলাপ

অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে বাস করতো গরিব এক কাঠুরিয়া। সে বনে ঘুরে ঘুরে কাঠ কাটতো আর সেগুলো বাজারে বিক্রি করতো। এভাবেই চলতে লাগলো তার দিনকাল।

কাঠুরিয়ার ছিল সুন্দর একখানা কুড়াল। প্রতিদিনের মতো আজও সে বের হয়েছে কাঠ কাটার জন্য। যে বনে সে কাঠ কাটে, সেখানে ছিল বহু পুরনো একটা সেগুন গাছ। কাঠুরিয়া যখন তার কুড়াল দিয়ে সেগুন গাছ কাটতে লাগলো, তখন সেগুন গাছের কী যে আহাজারি! অর্ধেক কাটার পর ক্লান্ত হয়ে কাঠুরিয়া যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, তখন গাছ কুড়ালকে বললো, ও কুড়াল ভাই! তোমার সঙ্গে তো আমার কোনো শত্রুতা নেই। তারপরও কেন তুমি আমাকে আঘাত করছো?

কুড়াল কিছু না বলে ভাবলো, সত্যিই তো! কেন আমি আঘাত করছি!

গাছ তিনবার কথাটা বলার পর কুড়াল বললো, ও গাছ ভাই! আমি কী করবো বলো, তুমি দেখছো যে, আমার গোড়াতে একটা ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রতে তোমার জাত ভাইয়ের একটা টুকরা দিয়ে হাতল তৈরি করে সেটায় ঢুকিয়ে তোমার শরীরে আঘাত করা হয়। আমি তো কিছুই করতে পারি না।

শিক্ষা : আজ সব জায়গায় নিজের জাত ভাই তার ভাইয়ের ক্ষতি করে চলেছে। সময় থাকতে সাবধান হওয়া দরকার।

ইঁদুর ও ব্যাঙের বন্ধুত্ব

এক জায়গায় এক ইঁদুর আর ব্যাঙ বাস করতো। তাদের মধ্যে ছিল গলায় গলায় বন্ধুত্ব। তারা একসঙ্গে খায়-দায়, খেলা করে, বেড়াতে যায়, সবই একসঙ্গে করে। কিন্তু ব্যাঙটার মাথায় একদিন দুষ্টুবুদ্ধি এলো। তাই সে একদিন ইঁদুরের পায়ের সঙ্গে নিজের পা বেঁধে খেলা করতে করতে পুকুরের ধারে এসে দিল পুকুরে এক ঝাপ। এতে ব্যাঙের আর কি। মজায় সে গ্যাঁ গ্যাঁ করতে লাগলো। আর ইঁদুরটি নাকানি চুবানি খেয়ে মারা গেল। এক সময় মরা ইঁদুরের দেহটা ফুলে ঢোল হয়ে পানির ওপর ভেসে উঠলো। ব্যাঙের পা তখনও তার পায়ের সঙ্গে বাঁধা। ইঁদুরটা ফুলে ফেঁপে বেশ ভারি হয়ে গেছে।

একটা পেঁচা দূর থেকে পানির ওপর ভেসেওঠা ইঁদুরটা দেখে এক ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে ব্যাঙকেও। কারণ ব্যাঙের পা তো ইঁদুরটার সঙ্গে বাঁধা ছিল। তাই পেঁচাটা শুধু মরা ইঁদুরটাই খেল না, সেই ব্যাঙকেও মজা করে খেল।

শিক্ষা : বোঝে না সোঝে না ছাগল বাঁধে ঠ্যাঙে
সুতা বেঁধে খাতির করে ইঁদুরে আর ব্যাঙে।

পিঠ যখন দেয়ালে

একটি শিকারী কুকুর ছিল। একদিন রাখাল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিল। হঠাৎ শিকারী কুকুরটা পাশের একটা ঝোপের মধ্যে একটা খরগোশ দেখতে পেল। দেখামাত্রই শিকারী কুকুরটা তাকে তাড়া করলো এবং খরগোশও কুকুরকে দেখতে পেয়েই দিল ছুট। কুকুরও ছুটছে খরগোশও ছুটছে। খরগোশও ছুটছে কুকুরও ছুটছে। কিন্তু ছুটলে কী হবে! খরগোশ চোখের নিমেষে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।
রাখালটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব দেখছিল। কুকুরটা খরগোশকে ধরতে পারলো না দেখে সে তাকে ব্যঙ্গ করে বললো, খুব বাহাদুর, এমন একটা ক্ষুদ্র জীব খরগোশ, তার সঙ্গেও ছুটে কুলিয়ে উঠতে পারলে না তুমি?
কুকুরটি এই ঠাট্টা হজম করে হেসে উত্তর দিল, আপনি বুঝলেন না তো! খরগোশটা ছুটেছিল প্রাণের দায়ে আর আমি ছুটেছিলাম শিকার করতে। তাই এই দুই জনের ছোটায় এত পার্থক্য।

শিক্ষা : দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সর্বশক্তি দিয়েই চেষ্টা করা হয়।

প্রতিপক্ষের কূটচাল

এক মাঠে অনেক ভেড়া চরে বেড়াতো। আর সেই ভেড়াদের পাহারা দিত কয়েকটা তেজী কুকুর। নেকড়েরা দূর থেকে দেখে কুকুরের ভয়ে আর তাদের কাছে ভিড়তে সাহস পেত না। মনে মনে বড় ক্ষোভ তাদের। একদিন তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, ঐ কুকুর ক'টাই আমাদের শত্রু, কোনো রকমে ওদের সরাতে পারলেই আমাদের অপারেশনটা সাকসেস হতো। কিন্তু কী করে সরানো যায়? সব সময়ই যে তারা ভেড়াগুলোর কাছে কাছে থাকে।

নেকড়েদের যখন মনের অবস্থা এমন, তখন কয়েকটা ভেড়াকে একান্তে পেয়ে গেল। এই সুযোগে নেকড়েরা বললো– ভাইরা, তোমরা আমাদের থেকে এমন দূরে দূরে থাকো কেন বলোতো? আমরা তো তোমাদের সঙ্গে ভাব করতে চাই! পারি না কেবল ঐ শত্রু কুকুর ক'টার জন্য। ওরা আমাদের দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে আসে। আর তা শুনলেই আমাদের খুব বিরক্ত লাগে। ওদের বিদায় করে দাও ভাইরা, তাহলেই দেখবে তোমাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। ভেবে দেখো, কাদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা লাভের। ওরা আর কয়টি! ভালো করে দেখো আমাদের দল কত বড়। আমাদের অনুরোধ তোমাদের জাত ভাইদের কাছে গিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলো। দেখবে, বললেই তারা বুঝবে।
বোকা ভেড়াগুলো নেকড়েদের কথায় ভুলে কুকুরগুলো বিদায় করে দিল।
এবার নেকড়েদের রাস্তা পরিষ্কার। নেকড়েরা ভেড়াগুলো রক্ষকহীন অবস্থায় পেয়ে নিজেদের খুশিমতো একটা একটা করে খেতে লাগলো। তখন ভেড়াগুলোর আফসোসের আর সীমা রইলো না। এক সময় সব ভেড়া খেয়ে সাবাড় করে ফেললো।

শিক্ষা : শত্রুরা এভাবেই প্রতিপক্ষের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে আক্রমণ করে বসে এবং এক সময় ঘায়েল করে ফেলে।

শিয়ালের চালাকি

এক রাজার একটা গরু ছিল। গরুটা বড়, শক্তিশালী ও দেখতে অনেক সুন্দর ছিল। এমন গরু সবখানে পাওয়া যায় না। রাজার প্রিয় গরুটা একদিন মরে গেল। রাজার সে কী কান্না! অনেক সময় ধরে তিনি কাঁদলেন। শেষে বললেন, ওটাকে দূরের কোনো মাঠে ফেলে দিয়ে এসো।
সেই মাঠের কাছে এক চালাক শিয়াল থাকতো। সে অনেক দিন পেট ভরে খেতে পায়নি। অনেক দিন পর মরা গরু পেয়ে শিয়াল খুব খুশি হলো। সে

গরুটা খেতে শুরু করলো। খেতে খেতে এক সময় সে গরুর পেটের ভেতরে ঢুকে গেল, তবুও তার ক্ষুধা মিটলো না। খেতে খেতে দু'দিন চলে গেল, তখনো সে গরুর পেটের ভেতরে বসে কেবল খাচ্ছে আর খাচ্ছে।
এতো দিনে রোদ লেগে গরুর চামড়া শুকিয়ে পেটের ফুটো ছোট হয়ে গেছে। আর শিয়ালও অনেক খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। তখন তো তার ভারী মুশকিল হলো। সে অনেক চেষ্টা করেও গরুর পেটের ভেতর থেকে বেরোতে পারলো না। এখন উপায় কী?

এক সময় তিনজন চাষী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের দেখতে পেয়েই শিয়ালের মাথায় এক ফন্দি এলো। সে গরুর পেটের ভেতর থেকে তাদের ডেকে বললো– ওহে মানুষ সব, তোমরা রাজার কাছে একটা সুসংবাদ দিতে পারবে? আমার পেটে যদি বায়ান্ন কলসি ঘি মাখানো হয়, তাহলে আবার আমি উঠে দাঁড়াতে পারবো।
চাষীরা তা শুনে খুবই অবাক হলো। তারা একে অন্যকে বললো, শোনো শোনো, গরু কী বলছে! তারা তখনই রাজার কাছে গিয়ে সব খুলে বললো।
সব শুনে রাজা মহাখুশি হলেন। তিনি বললেন, আমার গরু যদি সত্যি সত্যিই বেঁচে যায়, বায়ান্ন কলসি ঘি আর কী? প্রয়োজনে হাজার কলসি ঘি নিয়ে মাখাও।

তখনই কলসি কলসি ঘি নিয়ে মাঠে উপস্থিত হলো লোকজন। আর সেই ঘি সবাই মিলে গরুর পেটে মাখাতে লাগলো। সাতদিন পর্যন্ত চললো ঘি মাখানোর পর্ব। সাতদিন পর শিয়াল দেখলো, গরুর চামড়া নরম হয়ে এসেছে, পেটের ফুটোও বড় হয়েছে। এখনই সে ইচ্ছা করলে বেরিয়ে আসতে পারে। তখন সে সবাইকে ডেকে বললো– মানুষ সব, এইবার আমি উঠে দাঁড়াবো। তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, নইলে আমি যদি মাথা ঘুরে তোমাদের উপর পড়ে যাই!
এ কথা শুনে ভারী গোলমাল শুরু হলো। এসব কথা শুনে কেউ কি আর সেখানে দাঁড়ায়? ঘি-টি সব ফেলে তারা পালাতে লাগলো। একবার চেয়েও দেখলো না, গরু উঠছে কি পড়েই আছে। তা দেখে শিয়াল ভাবলো,

এইবারই পালাবার সুযোগ। আর দেরি না করে গরুর ভেতর থেকে বেরিয়ে সে দেয় ভোঁ দৌড়।

শিক্ষা : গুজবে না তলিয়ে আগে বিষয়টি ভালো করে যাচাই করে নেওয়া উচিত। চিলে কান নিয়েছে–বললেই চিলের পিছু না ছুটে আগে হাত দিয়ে দেখা দরকার, আসলেই কান নিয়েছে কি না। তাহলে পরে আর পস্তাতে হবে না।

বাঁদরের বাঁদরামি

একটা বিরাট নদীতে একদল জেলে মাছ ধরছিল। অনেকক্ষণ ধরে মাছ ধরার কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে নদীর পাড়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। তারপর নদীর ধারেই জাল-টাল রেখে একটু দূরে কিছু খেয়ে নিতে গেল।
একটা বাঁদর এতক্ষণ গাছের ডালে বসে এসব লক্ষ্য রাখছিল। বাঁদরটা মনে মনে নানা রকম ফন্দি আঁটছিল। জেলেরা দূরে চলে যেতেই বাঁদরটা টপ করে গাছের ডাল থেকে নেমে একেবারে জালটার কাছে চলে এলো। জালটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো বাঁদরটা। এরপর তার হঠাৎ ইচ্ছা হলো, সেও জেলেদের মতো জাল দিয়ে মাছ ধরবে।
তার ইচ্ছামতো বাঁদরটা জাল ফেলতে যেতেই জালটা গেল তার সারা শরীরে জড়িয়ে। সে যতই ছাড়াতে চেষ্টা করলো ততই জাল জড়িয়ে যেতে লাগলো। এই বুঝি সে জাল সুদ্ধ পানিতে পড়ে ডুবে যাবে। ফ্যাসাদে পড়া আর কাকে বলে! বাঁদরটি তখন ক্ষোভে দুঃখে মনে মনে বললো, উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার। জাল দিয়ে মাছ ধরা কি আমার কাজ! কখনো তো জাল ফেলা শিখিনি আমি। তাই আনাড়ির মতো জাল ফেলতে গিয়েই আমার এই দশা হয়েছে...।
ততক্ষণে খাওয়া-দাওয়া সেরে জেলেরা এসে পড়লো। এসেই বাঁদরটাকে তার বাঁদরামির জন্য উচিত শিক্ষা দিল।

শিক্ষা : যার যা স্বভাব সুযোগ পেলেই তা করতে চায়। আর মন্দ স্বভাবের জন্য আক্কেল সেলামিও দিতে হয়।

শিয়ালের কৃপণতা

অনেক আগের কথা। জঙ্গলের পাশের একটা গ্রামে একজন শিকারী থাকতো। তার বাড়িতে সে আর তার বউ দু'জন মিলেমিশে থাকতো। সে শিকারী ছিল বলে শিকার করেই সে চলতো। শিকার করা পশু-পাখির গোশত বিক্রি করে যে টাকা পয়সা পেত তা দিয়েই তার সংসার চলতো। শিকার করার জন্য কোনো কোনো দিন তাকে গভীর জঙ্গলের ভেতরেও যেতে হতো, আবার কখনোবা খুব সহজেই শিকার পেয়ে যেত।

একবার সে সারাদিন কোনো শিকার পায়নি। জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে এসেছে তবুও কোনো শিকার পেল না। এদিকে দিন ফুরিয়ে রাত হতে চললো। রাতের বেলা জঙ্গলে থাকা মোটেই নিরাপদ নয় তাই বাড়ির দিকে রওনা হলো। আজ তাকে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে। ফিরে আসার পথে সে একটা বনশুয়োর তার নজরে পড়লো। শিকারী ভাবলো, আজ এটাই শিকার করা যাক, তাহলে আর খালি হাতে ফিরতে হবে না। তার ধনুকে তুণ পরিয়ে বনশুয়োরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। তীর গিয়ে বিঁধলো একেবারে শুয়োরটার গায়ে। কিন্তু যেইনা তীর বনশুয়োরের গায়ে লেগেছে, সেও শিকারীকে দৌড়ে এসে আক্রমণ করে। সেই বনশুয়োরের ছিল বিশাল বড় বড় দাঁত, তাই দিয়ে সে শিকারীকে মেরে ফেললো। শুয়োরের শরীরেও তীর লেগেছিল, তাই সেও মারা গেল।

বনশুয়োরটা যখন মানুষটাকে মারার জন্য দৌড়ে আসছিল, তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা অজগর সাপ, তার উপরে বনশুয়োরের একটা পা পড়েছিল। সেটা ছিল বিশাল বড় একটা প্রাণী, তাই তার পায়ের চাপে সেই সাপটাও মরে গেল।

ঠিক তখনই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা শিয়াল, সে আবার দু'দিন ধরে কিছু খেতে পায়নি। একসঙ্গে এতো খাবার দেখতে পেয়ে তার আনন্দ আর দেখে কে। সে খুশিতে লাফাতে লাফাতে হিসাব করতে লাগলো– সাপটা খাওয়া যাবে দু'দিন, মানুষটা যাবে দশদিন আর শুয়োরটা যাবে আঠারো বিশ দিন। বাহ্ প্রায় এক মাসের খাবারের জোগাড় হয়ে গেল। সৃষ্টিকর্তা

যখন যাকে দেন এভাবেই উদার হাতে দেন। শিয়ালটা ভাবতে লাগলো, কোনটা আগে খাওয়া যায়– সাপটা, না মানুষটা, নাকি শুয়োরটা। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না আজ কোনটা খাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো, না আজ আর এদের কাউকে খাবে না, কাল থেকেই এদের খাওয়া শুরু করবে, আজকে ধনুকের এই ছিলাটা খেয়েই কাটিয়ে দেবে। শিকারীর ধনুকের ছিলাটি ছিল চামড়ার। ছিলাটা ধনুককে টান দিয়ে বাঁধা থাকে। শিয়াল যেই মাত্র সেটাতে কামড় বসালো অমনি ধনুকটি ঝটকা মেরে সোজা হয়ে শিয়ালের বুকের ভেতরে ঢুকে গেল আর কৃপণ শিয়ালটা মারা গেল।

শিক্ষা : সঞ্চয়ী হওয়া ভালো কিন্তু কৃপণ হওয়া ভালো নয়।

ঝগড়ার পরিণাম

একদেশে একবার দু'টি বিড়াল একটা ভারী নানরুটি পেয়েছিল। তবে সমস্যা দেখা দেয় বণ্টনে। তারা তা বণ্টন করার ক্ষেত্রে মতভেদ ও ঝগড়ার সৃষ্টি করে। এরপর তারা উভয়ে একমত হলো, তারা এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য বানরের কাছে যাবে। বানর তাদের মধ্যে এর সঠিক বণ্টন করে দিবে।

বানর রুটিটি প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করলো। এর মধ্যে এক টুকরা বড় ও এক টুকরা ছোট হয়ে গেল। বানর যেন ইচ্ছা করেই এমনটি করলো। বানর টুকরা দু'টিকে পাল্লায় তুললো। তখন দেখা গেল– পাল্লার এক প্রান্ত অন্য প্রান্ত থেকে ভারী হয়ে গেছে। এরপর সে বড় টুকরা থেকে এক কামড়ে বেশ খানিকটা খেয়ে ফেললো। ফলে তা অপর টুকরা থেকেও ছোট হয়ে গেল। আবার সে এগুলোকে পাল্লায় রাখলো। তখন দেখা গেল– এবার দ্বিতীয় পাল্লাটি প্রথমটি থেকে ভারী হয়ে গেছে। বানর এভাবে বারবার ভারী টুকরা থেকে এক কামড় করে খেতে থাকলো। এমন করে উভয় টুকরা খেয়ে প্রায় শেষ করে ফেললো।

তখন বানরের চালাকি বুঝতে পেরে বিড়াল দু'টি বললো, আমরা এ বণ্টনে সন্তুষ্ট আছি। আমাদের প্রত্যেককে এক টুকরা করে দিয়ে দাও।
তখন বানরটি বললো, পাল্লায় অবশিষ্ট যা আছে, তা আমার বণ্টন কাজের পারিশ্রমিক– একথা বলে বানর উভয় টুকরা একসঙ্গে তার মুখে পুরে নিল। বিড়াল দু'টি একে অন্যের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলো এবং ঝগড়া করার জন্য উভয়েই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো।

শিক্ষা : ঝগড়ার পরিণাম এমনই হয়। তাই কোনো ব্যাপারে আমরা ঝগড়া করবো না। সব সময় আমরা মিলেমিশে থাকবো।

ব্যাঙের অহংকার

জলাশয়ের ধারে একটি ব্যাঙ পরিবার বাস করতো। ব্যাঙ পরিবারের অনেক বাচ্চা-কাচ্চা ছিল। একদিন একটি ব্যাঙের বাচ্চা জলাশয়ের পাশে স্যাঁতস্যাঁতে মাঠে ঘুরতে গিয়েছিল। সেই মাঠে তখন একটি ষাঁড় চরে ঘাস খাচ্ছিল। বিশাল ষাঁড়টাকে দেখে বাচ্চা ব্যাঙটি প্রথম দিকে হকচকিয়ে গেল। পরে সাহস করে দূর থেকেই ভালো করে দেখতে লাগলো। আর যতই দেখতে লাগলো ততই অবাক হয়ে গেল। তারপর এক সময় সে ঘরে ফিরে এলো।
ফিরে এসে তার মাকে বললো– মা, মা, আজকে মাঠে আমি ইয়া বড় এক জন্তু দেখে এলাম। সে যে কত বড় আর কত মোটা তা না দেখলে বিশ্বাসই হবে না আপনার।
মা ব্যাঙটি তখন একটু অহংকারের সুরে বললো– এ্যাঁ, কী বললি? সে আমার চেয়েও বড়?
বাচ্চাটি একটু ব্যঙ্গ করে বললো– আরে মা, কী বলছেন আপনি! সে আপনার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড়।
মা ব্যাঙটি তখন তার পেটটা ফুলিয়ে বললো, এই এতো বড়?

বাচ্চা ব্যাঙটি তাচ্ছিল্যের সুরে হেসে বললো, হাসালেন আপনি মা, এটাতো তার একশো ভাগের এক ভাগও না।
মা ব্যাঙটি তখন তার পেটটা আরো ফুলিয়ে বললো, চেয়ে দ্যাখ এবার এতো বড় নিশ্চয়ই নয়!
বাচ্চা ব্যাঙটি বললো– মা, আপনি হাজার চেষ্টা করলেও তার মতো বিরাট হতে পারবেন না।
বাচ্চা ব্যাঙটির কথা শুনে মা ব্যাঙটি রেগেমেগে তার পেটটা আরো বড়, আরো বড় করে ফোলাতে যেতেই ফটাস করে তার পেটটা ফেটে গেল। আর ফেটে যেতেই মা ব্যাঙের সব নাড়িভুঁড়ি আর রক্তে জায়গাটা ভরে গেল। মা ব্যাঙটি তার অহংকারের কাছে ধ্বংস হয়ে গেল।

শিক্ষা : নিজের যোগ্যতার চেয়ে বেশি বাহাদুরি দেখাতে নেই। আর অহংকার যে পতনের মূল সে কথা কে না জানে!

কচ্ছপের বোকামী

আরেকটা জলাশয়ে একটা কচ্ছপ বাস করতো। সে যে জলাশয়ে বাস করতো সেখানে সারা বছর পানি থাকতো, তার পানিও ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে অনেক মাছ ছিল, কাঁকড়া ব্যাঙও ছিল। এগুলো খাওয়ার জন্য বিভিন্ন পাখি বাইরে থেকে আসতো। সেখানে যেসব পাখি, হাঁস এসেছিল তাদের মধ্যে দু'টি হাঁসের সঙ্গে কচ্ছপের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারা সেখানে বেশ ভালোই ছিল। একবার সেখানে বিরাট খরা দেখা দিল, বর্ষার সময় একফোঁটাও বৃষ্টি হলো না।
চারদিকের জলাশয়, পুকুর-ঘাট শুকিয়ে গেল। সেই জলাশয়টিও প্রায় শুকিয়ে গেছে। কচ্ছপের বন্ধু হাঁস দু'টি ঠিক করলো তারা সেই জলাশয় ছেড়ে চলে যাবে। কচ্ছপ কাতর হয়ে বললো, আমার কী হবে ভাই, আমি কি পানির অভাবে শুকিয়ে মরবো। হাঁস দু'টি সমস্যায় পড়লো, তাদের

সেই জলাশয় ছেড়ে যেতেই হবে, কিন্তু বন্ধুকে এভাবে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে যেতেও তাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল।

শেষে অনেক আলাপ আলোচনার পর তারা একটা উপায় বের করলো, একটা লাঠির মাঝখানে কচ্ছপটা কামড়ে ধরবে, আর হাঁস দু'টি দুই প্রান্তে ধরে সেটা উড়িয়ে নিয়ে কোনো বড় জলাশয়ে নিয়ে যাবে– যেখানে পানি শুকিয়ে যায়নি, অনেক পানি আছে। হাঁস দু'টি কচ্ছপকে সাবধান করে দিয়ে বললো, উড়ে যাওয়ার সময় কিন্তু একটা কথাও বলবে না, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কচ্ছপটি বললো, তোমরা কোনো চিন্তা করো না, আমি ভুলেও একটা কথা বলবো না। আমাকে কি তোমরা বোকা ভেবেছো!

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা উড়ে চললো। এভাবে উড়তে দেখে দুরন্ত ছেলের দল হইচই করে এদের পিছু নিল। ছেলেরা বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছিল। কেউ বলছে, এই কচ্ছপটা পেলে পুড়িয়ে গ্রিল করে খাব। কেউ বলছে, গোশত করে খাব। কেউ বলছে, কাবাব বানিয়ে খাব...। এমন নানান রকম কথা।

তাদের কথা শুনে হাঁস দু'টি কচ্ছপকে বললো, সাবধান! দুষ্ট ছেলেদের কথায় কান দিয়ো না, তাহলে কিন্তু মহাবিপদ হবে। দেখছো না ওরা কী বলছে– গ্রিল বানিয়ে খাবে, কাবাব বানিয়ে খাবে।

কিন্তু কচ্ছপ রেগে গিয়ে বললো, ওরা ছাই খাবে...। যেই বলেছে 'ওরা' অমনি মুখে ধরা লাঠি সরে গিয়ে ধপাস করে নিচে পড়ে গেল, পুরো কথাটাও বলতে পারলো না। হাঁস দু'টি দেখলো, নিচের ছেলেরা ওকে ধরে আনন্দে হইচই শুরু করে দিয়েছে। তখন ওর হাঁসবন্ধুদের সাবধান বাণীর কথা মনে পড়লো। কিন্তু ততক্ষণে সময় অনেক ফুরিয়ে গেছে।

হাঁস দু'টি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, বোকাদের মৃত্যু এভাবেই হয়।

হাঁসদের আর কিছুই করার রইলো না। তারা দুঃখভরা মনে দূর আকাশের বুকে হারিয়ে গেল।

শিক্ষা : বোকারা ধরা খাওয়ার পরই তাদের বোকামী টের পায়।

খেঁকশিয়ালের ভাগ্য

একবার একটা হরিণকে দখল করা নিয়ে এক ভালুক ও এক সিংহের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধ করতে করতে দু'জনেই জখম হয়ে পড়লো, এমনকি তাদের নড়াচড়ার শক্তিও রইলো না। তারা মরার মতো হয়ে সেখানেই পড়ে রইলো।

এক খেঁকশিয়াল সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে দুই মহাবীরের এই অবস্থা দেখে, আর একটা হরিণ দু'জনের মাঝখানে পড়ে থাকতেও দেখে। ভালুক আর সিংহের অবস্থা দেখে সে মরা হরিণটা কামড়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল।

তা দেখে শক্তিহীন সিংহ আর ভালুক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, দেখ ভাগ্য আর কাকে বলে? হরিণটার জন্য আমরা লড়াই করে মরলাম, আর কিছু না করে সেটা পেয়ে গেল একটা বজ্জাত খেঁকশিয়াল। আমরা সেটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেই ভালো হতো।

শিক্ষা : নিজেদের মধ্যে সব সময় ভালোবাসা অটুট রাখা উচিত। নিজেরা নিজেরা গণ্ডগোল করলে অপরের সুবিধা হয়।

ধৈর্যের ফল

এক গ্রামে এক পাতিশিয়াল বাস করতো। কিছুদিন খাবার না পেয়ে পেয়ে শেয়ালের পেটটা এক্কেবারে চুপসে গেল। একদিন সে বাধ্য হয়ে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটা গাছের খোড়লে বেশ কিছু রুটি আর গোশত রাখা আছে। রাখাল বালকদের কেউ হয়তো পরে খাবে বলে রেখে দিয়েছে। পাতিশিয়ালটা খাবার দেখেই খোড়লের ভেতরে ঢুকে পড়লো। আর গপ গপ করে খাবারগুলো সব চেটেপুটে খেয়ে নিল। ফলে তার চুপসানো পেটটা হয়ে

উঠলো দারুণ মোটা। এবার সে আর খোড়ল থেকে বেরোতে পারলো না। অনেক চেষ্টা করেও বেরোতে না পেরে সে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগলো।

পথ দিয়ে তখন আরেকটা শিয়াল যাচ্ছিল। যেতে যেতে খোড়লে পড়া শিয়ালকে কাঁদতে দেখে বললো, কী হলো ভাই তোমার? তুমি কেঁউ কেঁউ করছো কেন?

খোড়লে আটকে পড়া শিয়ালটি তখন তার সমস্যার কথা খুলে বললো। তখন পথচারী শিয়ালটা বললো, ও তাই বুঝি! তো একটু সবুর করো, পেট তোমার আবার আগের মতো চুপসে যাবে। তখন অনায়াসে খোড়ল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এজন্য এতো দুশ্চিন্তার কী আছে?

পথচারী শিয়ালের কথামতো পাতিশিয়াল ধৈর্য ধরে বসে রইলো এবং পেট ছোট হয়ে এলে খোড়ল থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এলো।

শিক্ষা : ধৈর্যের একটা ফলতো অবশ্যই আছে। কথায়ই তো আছে– সবুরে মেওয়া ফলে।

শক্তিশালী বাঘ ও দুর্বল সারস

একবার এক বাঘের গলায় এক টুকরো হাড় ফুটেছিল। অনেকদিন ধরে বাঘটি গোশত খেয়ে আসছে, তবে এবারের মতো তার গলায় কখনো হাড় ফোটেনি। দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছিল বাঘের। হাড়টা বের করতে নিজে অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুতেই বের করতে পারলো না। তাই বাঘ মনে মনে বললো, উহ্ এমন কাউকে পেতাম, যে হাড়টা টেনে বের করে দিতে পারে...!

এমন সময় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক সারস পাখি। সারসকে যেতে দেখে বাঘ অতি কষ্টে বললো– ভাই, আমার একটা উপকার করতে পারবে! আমার গলায় হাড় ফুটেছে, এই হাড়টা যদি তুমি বের করে দিতে পার, তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কার দেব।

বাঘের কথায় সারস গলে পানি হয়ে গেল। বাঘের মতো প্রাণী তাকে উপকার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। তার যেন একটু গর্বই হলো। এরপর সারস বাঘের গলার ভেতর নিজের ঠোঁট ঢুকিয়ে অনায়াসে ফুটে থাকা হাড়টা বের করে দিল। এরপর সে বললো, হাড় তো বের করে দিলাম, এবার আমার পুরস্কার দিন।

বাঘ দুষ্টের হাসি হেসে বললো, বাঘের মুখ থেকে তোর মাথাটা আস্ত বের করে নিতে পেরেছিস, সেটাই তো তোর পুরস্কার রে! এরপরও আবার পুরস্কার চাইছিস? ভাগ হতভাগা এখান থেকে! টু শব্দটি করলে এক্ষুণি পেটে চালান করে দেব।

শিক্ষা : ক্ষমতা থাকলেই দুর্বলের দ্বারা স্বার্থ হাসিল করে এভাবে কেটে পড়া মারাত্মক অন্যায়।

অত্যাচারী বিড়াল

এক গ্রামে এক বিড়াল ছিল। সে গৃহস্থের বাড়িতে এটা ওটা চুরি করে খেতো। একবার বিড়ালটা এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে একটা মোরগ ধরে নিয়ে এলো। তখন সে মোরগটাকে মেরে খেতে চাইলো। কিন্তু শুধু শুধু তো একজনকে মারা যায় না, একটা অজুহাত থাকা চাই। সে তখন মোরগটাকে বললো, তুই মারাত্মক একটা আপদ, রাতে ডেকে মানুষকে শান্তিতে ঘুমোতে দিস না।

মোরগ উত্তরে বললো, এটাতো আমি ভালো উদ্দেশে করি। রাত শেষে আমার ডাকে ঘুম ভাঙলে মানুষরা সকাল সকাল তাদের দিনের কাজ শুরু করতে পারে। নামাজিরা উঠে নামাজ পড়তে পারে।

বিড়াল তখন ভাবলো, মোরগ তো কথাটা ঠিকই বলেছে। তাই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে অন্য একটা দোষ ধরে বললো, তুই তোর মা-বোনদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস। অত্যাচার করিস।

মোরগ তখন শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, এতেই আমার মালিক খুশি হয়। এতে মালিকের সম্পদ বাড়ে।
বিড়াল তখন বিরক্ত হয়ে বললো, নাহ! তোর সঙ্গে বেশি ফ্যাচফ্যাচ করার সময় আমার নেই। কিন্তু তাই বলে আমার যে পেটে ক্ষুধা পুষে রাখতে হবে, তারও কোনো মানে নেই, তোকে আমি খাবই।—এই বলে বিড়াল মোরগের টুঁটি চেপে ধরে খেতে শুরু করলো।

শিক্ষা : এভাবেই যুগ যুগ ধরে সবল অত্যাচারীরা দুর্বলদের ওপর জুলুম করে চলেছে।

কুমির ও বানর

নদীর তীরে একটি জামগাছ ছিল। জামগাছে থাকতো একটি বানর। আর নদীতে থাকতো একটি কুমির। দু'জনের মধ্যে ছিল খুব ভাব। কিন্তু কুমির ছিল লোভী। বহুদিন ধরে তার ইচ্ছা হলো, সে বানরের কলিজা খাবে। এজন্যই কুমির বানরের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে।
কুমির একদিন বানরকে বললো, ও ভাই বানর! তুমি সারাদিন গাছে থেকেই আমার সঙ্গে কথা বল। একবারও নিচে নামো না। আর আমি সারাদিন পানিতে ঘুরে বেড়াই। কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখি। চলো না, আজকে তোমাকে নিয়ে ঘুরে আসি!
বানর বললো, কিন্তু আমি তো তোমার মতো পানিতে ডুবে থাকতে পারি না! আমি কিভাবে ঘুরবো তোমার সঙ্গে?
কুমির বললো, কোনো চিন্তা করো না। তুমি শুধু আমার পিঠে উঠে বসে থাকবে। আমিই তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব।
তার কথায় বানর গাছ থেকে নেমে কুমিরের পিঠে চড়ে বসলো। কুমির তাকে নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। মাঝনদীতে গিয়ে কুমির বললো, অনেকদিন পর তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি, এখন তোমার পালানোর

কোনো সুযোগ নেই। আমার অনেক দিনের শখ, তোমার কলিজা খাব। সঙ্গে সঙ্গে বানর বুদ্ধি করে বললো, হায় হায়! আগে বলবে তো, আমার কলিজা তো গাছেই রেখে চলে এসেছি!

কুমির বললো, এখন কী হবে?

বানর বললো, তাহলে আমাকে সেই গাছের কাছে নিয়ে চলো। তারপর তোমাকে কলিজা এনে দিচ্ছি।

কুমির রওনা দিল গাছের দিকে। গাছের কাছে যেতেই বানর এক লাফে গাছে উঠে বসল। গাছের উপরে গিয়ে বানর বললো, বোকা কুমির! কলিজা কি কখনো গাছে থাকে? কলিজা থাকে যার যার সঙ্গে।

কুমির ভেবে দেখলো, তাইতো! নিজের বোকামীর জন্য হেরে গিয়ে কুমির আফসোস করতে করতে চলে গেল। তার বানরের কলিজা খাওয়ার শখ আর পূরণ হলো না।

শিক্ষা : কারো যেকোনো কথায় গলে যেতে নেই এবং যার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নেই। কথায় আছে না– সৎসঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

অত্যাচারী মোরগরাজ

একটি চালাক মোরগের কথা। বিশাল সাইজের মোরগটির যেমন ছিল তেল, চকচকে পালক ও লেজের বাহার, তেমনি ছিল মাথার ফুল। ফুলটি এতোই লাল ছিল যে, দেখলেই মনে হতো আগুন। সুন্দর হলে কী হবে, মোরগটি ছিল খুবই অলস ও অত্যাচারী। মোরগটি যখন হেলে দুলে হাঁটতো তখন মনে হতো কোনো রাজা-বাদশাহ হেঁটে যাচ্ছে। অত্যাচারী মোরগটিকে দেখে পথের সবাই অনেক ভয় পেত।

মোরগটি তাদের ভয় ও দুর্বলতাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে চিন্তা করতো। চিন্তার এক পর্যায়ে তার মাথায় একটি দুষ্টবুদ্ধির উদয় হলো। মোরগের বাড়ির পাশেই ছিল বিড়ালদের পল্লী। বিড়াল পল্লীর কারো অবস্থাই তেমন ভালো ছিল না। বলা যায় তারা সবাই ছিল দিনমজুর

শ্রেণীর। সারাদিনই তাদেরকে জীবিকা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হতো। এজন্য তারা কিছুটা ভীরু প্রকৃতিরও ছিল। বিড়ালদের এ দুর্বলতার কথা চালাক মোরগটি জানতো। তাই মোরগটি একদিন বিড়াল পল্লীর সবাইকে মিটিংয়ে আসার দাওয়াত দিল। গরিব বিড়ালরা কি মোরগ রাজার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে? তাই দেখা গেল, নির্দিষ্ট সময়ে সব বিড়াল এসে হাজির হলো মিটিংয়ে।

সবাই হাজির হওয়ার পর মোরগ বিড়ালদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, প্রিয় বিড়াল ভাইয়েরা! তোমরা সবাই আমার প্রতিবেশী। আমিও তোমাদের প্রতিবেশী। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকায় বসবাস করে আসছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের কোনো অভিভাবক বা শাসক নেই। তাই আমাদের উচিত একজন নেতা নির্বাচন করা। যার হুকুমে সবাই চলবো। তোমরা কি আমার প্রস্তাবে রাজি?

মোরগের প্রস্তাবে বিড়ালরা রাজি ছিল না। কিন্তু অত্যাচারী মোরগের ভয়ে তারা 'না' করতে পারলো না। বিড়ালদের একজন দাঁড়িয়ে বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন মোরগরাজ। আমাদের একজন নেতা দরকার। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকেই আমরা নেতা বানাতে চাই।

এ প্রস্তাব শুনে মোরগ খুশি হলেও তা প্রকাশ না করে বললো, তোমরা এটা কী বললে? আমি কি তোমাদের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখি?

নেতাগোছের একটি বিড়াল বললো, অবশ্যই আপনি আমাদের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। আমরা আপনার কোনো ওজর-আপত্তি শুনতে চাই না। আমাদের একটাই কথা, আপনিই হবেন আমাদের নেতা।

ক্ষমতালোভী মোরগ যেন এ প্রস্তাবের অপেক্ষায়ই ছিল। বিড়ালদের প্রস্তাবে আর কোনো চিন্তা না করেই রাজি হয়ে গেল। তবে সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালদের কাছ থেকে এ ওয়াদা নিল, তারা প্রতিদিন মোরগের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে উঁইপোকা পাঠাবে। কারণ খাদ্য হিসেবে উঁইপোকা মোরগের খুবই প্রিয়।

বিড়ালরা মোরগের এ প্রস্তাবেও রাজি হয়ে গেল। মোরগ যা চেয়েছিল তা ঠিক ঠিক পেয়ে গেল। মোরগের আনন্দ আর দেখে কে! নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর মোরগ নিজের জন্য কারুকার্য খচিত বিশাল একটি হুইল চেয়ার তৈরি করে নিল। ওই চেয়ারে বসেই বিড়ালদের ওপর তার কর্তৃত্ব

খাটাতে লাগলো। বিড়ালরা প্রতিদিনই মোরগের জন্য প্রচুর পরিমাণ উঁইপোকা আনতে লাগলো। এভাবে উঁইপোকা আনতে আনতে এক সময় জায়গাটা প্রায় উঁইপোকাশূন্য হয়ে গেল। তাছাড়া উঁইপোকা ধরতে সারাদিন চলে যাওয়ায় বিড়ালরা নিজেদের খাবার সংগ্রহ করতে পারছিল না। তাই মোরগের জন্য উঁইপোকা আনতে তারা অনীহা প্রকাশ করলো। চালাক মোরগ ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পারলো। কিন্তু তার কী করার আছে! এতদিনের আয়েশি শরীর। তার ওপর বসে বসে খাওয়ার ফলে ভুঁড়িটাও দিন দিন বিশাল আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থায় তার পক্ষে কি দিনমজুরদের মতো মাঠে-ময়দানে গিয়ে উঁইপোকা ধরে খাওয়া সম্ভব? তাই সে নীলকরদের মতো বিড়ালদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিল, যেভাবেই হোক আমার উঁইপোকা চাই। প্রজারা কিভাবে উঁই ধরবে এটা রাজার দেখার বিষয় নয়। তোমরা যদি উঁই আনতে গড়িমসি কর, তাহলে আমার মাথায় আগুনের যে ফুল দেখছ, সে আগুন দিয়ে সবাইকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মেরে ফেলবো।

মোরগরাজার হুমকি শুনে বাধ্য হয়েই বিড়ালরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে উঁই সরবরাহ করতে লাগলো। এক সময় বিড়ালরাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হাহাকার উঠলো ঘরে ঘরে। এ সময় ঘটলো একটি চমৎকার ঘটনা। এক মা বিড়াল তার বাচ্চাদের জন্য রান্না করতে গিয়ে দেখলো চুলায় আগুন নেই। তখন বিড়ালটির মনে পড়লো মোরগের কথা। সে তাড়াতাড়ি তার একটি বাচ্চাকে কিছু পাটকাঠি দিয়ে আগুন আনার জন্য মোরগের বাড়িতে পাঠালো। বাচ্চা বিড়ালটি মোরগ রাজার বাড়ি গিয়ে দেখলো মোরগ চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। মোরগকে ঘুম থেকে ডাকার সাহস পেল না বাচ্চা বিড়ালটি। এ সময় তার মাথায় খেলে গেল এক দুষ্টুবুদ্ধি। বিড়ালটি চুপি চুপি মোরগের কাছে গেল এবং আগুন নেওয়ার জন্য পাটকাঠিটি মোরগের মাথায় ধরলো। কিন্তু এ কি! আগুন ধরাতো দূরের কথা, একটু ধোঁয়াও তো উড়ছে না! বাচ্চা বিড়ালটি আর অপেক্ষা না করে দ্রুত তার মায়ের কাছে এসে সবকিছু খুলে বললো। মা বিড়াল তার বাচ্চার কথা মোটেই বিশ্বাস করলো না। বরং রেগে গিয়ে বললো, না বাপু, তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমি না থাকলে তোদের যে কী দশা হবে? এই বলে মা বিড়াল নিজেই আগুন আনার জন্য মোরগ রাজার বাড়ি গেল এবং

দেখলো মোরগ সত্যি সত্যিই ঘুমাচ্ছে। আর তার বিশাল পেটটি ওঠানামা করছে। এ দৃশ্য দেখে বিড়ালের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তবু পরীক্ষা করার জন্য বিড়ালটি পা টিপে টিপে মোরগের মাথার কাছে গেল। এরপর মোরগের মাথার আগুনের মতো লাল ফুলটিতে পাটকাঠি ছোঁয়ালো। কিন্তু সত্যি সত্যিই আগুন ধরলো না। মা বিড়ালটি সঙ্গে সঙ্গে মোরগের চালাকি বুঝতে পারলো। মা বিড়াল বাড়ি ফিরে বিড়াল পল্লীর সবার কাছে মোরগের চালাকির কথা প্রকাশ করে দিল। আর যায় কোথায়? ভীরু বিড়ালরাও সাহসী হয়ে উঠলো। অত্যাচারী মোরগের বিরুদ্ধে তারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুললো, 'অত্যাচারী মোরগ রাজ–ধ্বংস হোক নিপাত যাক, মিথ্যাবাদী মোরগ রাজ–ধ্বংস হোক নিপাত যাক, মোরগ রাজের কালো হাত–ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও'।

স্লোগানের শব্দ শুনে মোরগের ঘুম ভেঙে গেল। আড়মোড়া কাটতে কাটতে বাইরে বেরিয়ে এসেই মোরগের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। শত শত বিড়াল ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে তার বাড়ির দিকেই আসছে। স্লোগানের ধরন শুনেই মোরগ বুঝতে পারলো তার সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে জান বাঁচানোর জন্য উড়াল দিয়ে একটি উঁচু ডালে বসলো। উপর থেকে দেখতে পেল– তার সাধের সিংহাসন, বাসাবাড়ি সবকিছু আগুন দিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে বিড়ালরা। মোরগ জানে বেঁচে গেলেও বিড়াল পল্লীতে আর আসতে পারলো না। ফলে সেখানে শান্তি ফিরে এলো। বিড়ালরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।

শিক্ষা : অত্যাচারী চিরকালই ভীরু। তাদের হুমকি-ধমকির বিরুদ্ধে সাহস করে একবার দাঁড়াতে পারলে এক সময় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

সমাপ্ত

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম ১৯৮০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার খামারগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নব্বই দশকের শুরুর দিকে ক্যাম্পাসের বড় ভাইদের দেয়ালিকা লেখা দেখতে দেখতে তিনি লেখতে শুরু করেন। তৎকালীন মাসিক জাগো মুজাহিদ-এর জানুয়ারি-১৯৯৫ সংখ্যায় ছাপার হরফে তার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। তার লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ৫০টির মতো। রয়েছে বেশকিছু সম্পাদিত গ্রন্থ। সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তার বিচরণ রয়েছে। তবে কুরআন-হাদিস এবং আকাবির ও ইতিহাসের গল্পগুলো চমৎকার মুনশিয়ানায় উঠে আসে তার কলমে। 'জীবন গড়ো সিরিজ' ও 'খোশবু সিরিজ'-এ লিখেছেন ছোটদের জন্য চমৎকার কিছু বই। ছড়া-কবিতা রচনায় আছে আলাদা ঝোঁক ও শক্তিমত্তা। ইসলামি সংগীত রচনায়ও তার দখল রয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী থেকে তার অনেক সংগীত রিলিজ হয়েছে এবং শ্রোতামহলে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

লেখালেখিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি মাসিক আদর্শ নারী লেখক সম্মাননা-২০১২; সত্যের সন্ধানে লেখক সম্মাননা-২০১৫, কাব্যকথা জাতীয় সাহিত্য পদক-২০১৫, আমরা এক কাফেলা লেখক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সম্মাননা-২০২১, স্বপ্নসিঁড়ি গীতিকার সম্মাননা-২০২২, কওমী ইয়ুথ ক্লাব সম্মাননা-২০২৩ সহ অনেক পুরস্কার ও সনদ লাভ করেছেন।

তিনি ২০০১ সালে বেফাকের অধীনে জামিয়া আরাবিয়া কাসেমুল উলূম কুমিল্লা থেকে দাওরায়ে হাদিস এবং ২০০৪ সালে সোনাকান্দা দারুল হুদা বহুমুখী কামিল মাদরাসা কুমিল্লা থেকে কামিল [মাস্টার্স] সম্পন্ন করেন। এছাড়াও লেখালেখি ও সাংবাদিকতা বিষয়ক বিভিন্ন কোর্স ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন। এক যুগেরও বেশি সময় তিনি মাসিক আদর্শ নারী'র সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি লেখালেখি, সম্পাদনা এবং শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি লেখকপত্রের নির্বাহী সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ইসলামি লেখক ফোরামের সভাপতি। বইপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশের ঠিকানা সম্পাদনা কেন্দ্রে'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকও তিনি।

–শামসুদ্দীন সাদী
লেখক, অনুবাদক

শিক্ষণীয় মজার গল্পের চমৎকার সমাবেশ

অল্প বিদ্যা ভয়ংকর

মাওলানা মুনীরুল ইসলাম



আনোয়ার লাইব্রেরী
১১/১, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২-৪৭১১৬৫৭০
anwarlibrarybd@gmail.com